প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ

শিবরাম চক্রবর্তী

দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড
কলিকাতা—৬

রূপকার
শৈল চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক
প্রসাদকুমার সিংহ
দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড
২২।১, কর্নওঅলিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর
গিরীন্দ্রনাথ সিংহ
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৬

আড়াই টাকা

মহাস্থবির
শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে

শিবরামের লেখায়

শ্রীশৈলর রেখায়

প্রথম পর্ব
ঐক্য

এবারে শারদীয়ায় কাকে কী তত্ব দেয়া যায়, সেই সমস্যায় পড়া গেছল। সারা বছর কেউ কারো তত্ব নেব না এবং পূজোর সময় সে-সমস্তর প্রতিশোধ নেব, এই আমাদের চিরাচরিত পারিবারিক প্রথা। পূজোর তত্বকথা! এই দারুণ দুর্বৎসরে উক্ত প্রথার কোনোরূপ ইতরবিশেষ করা যায় কিনা ঠাওর করছিলাম।

"উঁহু। তা হয় না।" ঘাড় নাড়ল কল্পনা। পরিবারের কাছ থেকেই বাধা এল প্রথম!

"তাহলে উপহার-দ্রব্য নিয়েও মাথা ঘামানোর দরকার নেই।" আমি বলি ঃ "মঞ্জুকে একটা সিল্কের রুমাল, মামাকে এক কৌটো সিগ্রেট্, সৌম্যকে একখানা ভালো বই, আমারই বই একখানা, আর রঞ্জনকে একটি ছড়ি—এই দেয়া যাক্। এই —এই দিয়েই এবারকার হাঙ্গামা চুকিয়ে দিলে কী ক্ষতি?"

"ক্ষতি নেই?" কল্পনা জিজ্ঞেস করে।

"খতিয়ে দেখলে ক্ষতিই অবশ্যি! উপহারের ছড়াছড়ি করার আমিও পক্ষপাতী নই। কিন্তু তুমিই আবার বল্‌ছো—"

"আমি মোটেই ওই দিতে বলছিনে।" কল্পনা বাধা দিয়ে বলে : "উপযুক্ত উপহার কী দেয়া যায় তাই আমি ভেবে দেখতে বলেছি।"

"ভেবে দেখতে আমি নারাজ নই।" আমি স্বীকার করি। —"কিন্তু আমার কেমন ভয় হচ্ছে যে ভাবতে গেলেই আরো বেশি খরচের ধাক্কায় পড়ে যাব।"

"উপহার তো দিতেই হবে। কিন্তু তা যাতে দেবার মতো হয় তা কি ভাবতে হবে না? আহা, কে যে কী চায়, সেইটে যদি কোনো উপায়ে জানা যেত—"

"রক্ষে করো! আমরা বাঞ্ছাকল্পতরু হতে পারব না।" আমি ককিয়ে উঠি।

"কল্পতরু না হই, তাদের ইচ্ছার একটুও তো পূরণ করতে পারি। চেষ্টা করলে করা যায় না কি?"

"একটুখানির মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা সীমাবদ্ধ রাখার মানুষ কি না তারা! আত্মীয়দের ভালোমতই আমার জানা আছে,— চিনতে আর বাকী নেই। আমার 'আত্মীয়তা বজায় রাখা সোজা নয়' (মূল্য পাঁচ সিকে) বইখানা পড়েচো কি? সেতো তাদেরই ইতিকথা। তাদের মনের মধ্যে হানা দিতে গিয়ে—"

"সোজাসুজি কি তাদের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি না কি? আমার বাপের বাড়িতে এরকম ব্যাপারে কী করা হয়ে থাকে জানো?" জিজ্ঞেস করে কল্পনা।

কল্পনার পিত্রালয়ের রহস্য আমার কল্পনাতীত। আমি ঘাড় নেড়ে আমার অজ্ঞতা জানাই। উপহারের স্থলে সেখানে

প্রহার দেওয়া হয় কি না, তাই ওদের পৈতৃক পদ্ধতি কি না, জানবার আমার কৌতূহল হয়।

"ইচ্ছাময়ের লীলা বলে' একরকমের খেলা আমরা খেলি। পূজোর অনেক আগে আত্মীয়বন্ধুদের ডেকে একটা পার্টি দিই। সেই আসরেই খেলাটা ফাঁদা হয়। কার কী কী জিনিস পাবার কামনা, প্রত্যেককে তার তালিকা বানাতে বলা হয়। তারপরে যে কী হয় আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"দিস্তা দিস্তা কাগজ আনার দরকার পড়ে বোধহয়?" আমি অনুমান করি।—"তাহলে বলো, রীম্‌খানেক কাগজের জন্যে বামারলরীতে অর্ডার দেয়া যাক্?"

"বাজে বোকো না।" ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ও: "মনে হচ্ছে ছ'টা ইঞ্চের মধ্যেই তালিকা সম্পূর্ণ করতে বলা হোতো। আমরাও ওদের নেমন্তন্নের আসরে ডেকে এনে তাই বলবো। তাহলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। তাহলেই তো ফর্দ আর বাড়তে পারবে না।"

"বেশ, তারপর?"

"তারপরে, ইচ্ছা পূরণের জন্য একজন করে' আসর থেকে উঠে পাশের ঘরে যাবে—"

"যেমন ধরা যাক্ মঞ্জুলিকা।" আমি উদাহরণের পক্ষপাতী। দৃষ্টান্তের স্বরূপছাড়া কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করা—সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে সুকঠিন।

"বেশ, মঞ্জুই হোলো নাহয়।"

"তাহলে আরেকজনকেও তো যেতে হবে তার সঙ্গে।" বলি আমি।

"কেন? আরেকজন কেন?"

"বাঃ, আর কেউ না গেলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি করে'?"

"এ তোমার—যতো—ইয়ের খেলা নয়।" কল্পনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে: "একেবারে আলাদা জিনিস।"

"কিন্তু মঞ্জুর মন যা চায় তাইতো যোগাতে হবে? মনে মনে সর্বদাই সে পরমুখাপেক্ষী। তার মুখ্য ইচ্ছাই হোলো—"

"চুমু খাবার? তুমিই ভালো জানো! কিন্তু সেসব এখানে চলবে না।"

"তাহলে সেরকম ইচ্ছাপূরণে কারো বিশেষ উৎসাহ হবে বলে মনে হয় না।" আমিও জানাতে বাধ্য হই।

"না হোলো বয়েই গেল! আমাদের তালিকা পাওয়া নিয়ে কথা। তাদের মনের ইচ্ছাটা জানার শুধু দরকার। কাগজ পেন্সিল নিয়ে নাহয় দুজন দুজন করেই পাশের ঘরে যাবে—"

"কিন্তু জোড়া গেঁথে যদি আমরা পাশের ঘরে পাঠাই তাহলে তারা কখন ফিরবে তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে? কোন্ ঘরে শেষ পর্যন্ত তাদের পাওয়া যাবে তাও বলা মুস্কিল! এমন কি,—" বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই।

"মুস্কিল কিসের?" ও জিগেস করে।

"মানে, আদৌ ফিরবে কিনা, কোনো ঘরেই পাওয়া যাবে

কি না তাই বা কে জানে।" আমার উপসংহার। আত্মীয়রা এবং আত্মীয়তা স্বভাবতই আমার কাছে রহস্যময়।

"তাহলে—তাহলে না হয় এক একজন করেই ছাড়া যাবে।" কল্পনা বলে : "তারপরে আর কি, তালিকার ছ'টা আইটেমের মধ্যে যেগুলো বেশ ব্যয়সাধ্য সেগুলো ছেঁটে বাদ দিলেই হবে। তখন খুব সহজেই আমাদের দেবার জিনিস আমরা বেছে নিতে পারবো।"

"যেমন—ধরা যাক্—" আবার আমার উদাহরণের প্রতি টান : "আমাদের মামাবাবু চান্—

১। রোল্স্ রয়েস্ গাড়ি,

২। বিমানপথে ভূ-ভারত-ভ্রমণ,

৩। বালিগঞ্জে বাড়ি,

৪। বাঘ শিকার করতে,

৫। কোনো বিশেষ চিত্রতারকার পতিত্ব, এবং ৬। ভালো এক কৌটো সিগ্রেট, তাহলে তিনি খালি সিগ্রেট্ই উপহার পাবেন:। কেমন, এই তো?"

"ঠিক তাই। তালিকার কোথাও না কোথাও তাঁর মনের তাল পাওয়া যাবেই। যে তাল আমাদের মনের সুরের সঙ্গে খাপ্ খাবে।"

কল্পনার ইচ্ছামতো, অভিলাষ-আসর জমানো গেল।

তালিকাও পাওয়া গেল যথারীতি। কিন্তু পেয়ে দেখা গেল, না পেলেই ছিল ভালো! আমাদের আত্মীয়দের উচ্চাকাঙ্খা কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও হার মানায়। মানুষকে আত্মহারা করে দেয়। মুক্তকচ্ছ করে মহাপ্রস্থানের পথে টানতে থাকে।

মঞ্জু, তার ইচ্ছা-তালিকায় চেয়েছে দেখলাম—এক, একখানা বাড়ি, সিমলাশৈলে হলেই ভালো হয়, নেহাৎপক্ষে সিমলা স্ট্রীটে হলেও ক্ষতি নেই; দুই, অভিনেত্রী-জীবন (বলাবাহুল্য, চিত্রনায়িকারূপে); তিন, কাশ্মীর বেড়ানো; চার, লাখ খানেক টাকা (অনেক কমসম করেই); পাঁচ, নতুন ডিজাইনের ডজন খানেক শাড়ি; আর, ছ'নম্বরে, দেশবিখ্যাত স্বামী।

তালিকাটা আগাগোড়া চষে গেলাম—ওর কটুকষায় উপসমাপ্তি অবধি। ওর শেষ প্রার্থনাটা আমার দ্বারা পূর্ণ হবার নয়! খোঁচাটা আমার লাগলো। কিন্তু আমার অভাবে, ওর এই অপূরণীয় ক্ষতি কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা কে জানে!

"সিল্কের রুমাল।" সাব্যস্ত করল কল্পনা।

"সিল্কের রুমালের কথা কোথাও কিন্তু নেই ওর।" আমি আপত্তি করি।

"তাই চেয়েছে পাকে প্রকারে!" কল্পনা গর্জে ওঠে: "ওরকম চালচলনে সিল্কের রুমাল না হলে মানায় না। উঁচু নজরটা দেখেচ?"

"আহা, তোমারই তো বোন্—" আমি বলতে যাই।

"আমাদের আজে-বাজে স্বামী হলে চলে যায়, আর ওঁর চাই কি না—!" কল্পনা গজরাতে থাকে।

"সত্যি! সন্দেশবিখ্যাত স্বামী চাইলেও না হয় একটা গতি করতে পারা যেত! কিন্তু—" কিন্তু ভীম নাগও এহেন নাগিনীর বিষাক্ত নিশ্বাসের আওতায় আসতে চাইবেন কি না ভাবতে গিয়ে আমায় থামতে হয়।

•

আমাদের মামাবাবুর চাহিদাটা একটু রাজনৈতিক। তিনি কলকাতার মেয়র হতে চেয়েছেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একজন হতেও তাঁর অনিচ্ছা নেই! ওই দুইয়ের একটাও যদি ঘটে যায় তাহলে কলকাতায় বাড়ি পাবার আকাঙ্খাকে তিনি তিন নম্বরের মধ্যে আনতেই রাজি নন্; কেননা পূর্বোক্তরূপ বাড়াবাড়ি তাঁর ভাগ্যে ঘটলে ঘরবাড়ি ইত্যাদি অবলীলাক্রমে আপনা থেকেই এসে যাবে। চতুর্থতঃ, রাজপ্রমুখ উপাধি লাভ করা। রাজত্ব না থাকলে যে রাজপ্রমুখ হওয়া যায় না একথা মানতে তিনি নারাজ। পঞ্চমতঃ, বিখ্যাত-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদের মত সম্রাট পঞ্চম জর্জের করমর্দন (তাঁর দেহরক্ষার ফলে সেটা আপাততঃ অসম্ভব বিধায় তৎস্থলীয় সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ কিংবা রাজকুমারী এলিজাবেথ হলেও তাঁর আপত্তি নেই!) ষষ্ঠতঃ, সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে পদস্থতা (সেজন্য যেকোনো অপদস্থতা মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন)।

তাঁকে এক কৌটো সিগ্রেট্ দিলেই হবে, আমরা বিবেচনা করে' দেখলুম। কেননা যদ্দূর অবধি দৃষ্টি যায়, তাঁর রাজনৈতিক জীবন ধোঁয়াতেই পরিসমাপ্ত হতে বাধ্য, দেখা গেল।

সৌম্য চেয়েছে (১) একটা মোটর সাইকেল (২) কোডাকের ক্যামেরা (৩) রাণিং শূ (৪) সাঁতার কাটবার নিজস্ব একটা পুকুর (৫) একখানা ভালো ডিটেকটিভ বই (৬) আস্ত একটা এরোপ্লেন।

ওর ইচ্ছামত, একখানা গোয়েন্দাকাহিনী ওকে দিতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হোলো না! ব্ল্যাক্ গার্ল্স্ সার্চ ফর্ গড্—বার্ণার্ডশ'র সেই বইখানা পড়ে ছিলো—দিয়ে দেয়া গেল।

রঞ্জনের অভিলাষ একটু বিচিত্র রকমের। বন্দুক, পিস্তল, রিভল্বার, হ্যাণ্ড্গ্রেনেড্ ইত্যাদি মারাত্মক যত অস্ত্রশস্ত্রেই তার অভিরুচি! এবং একেবারে কম্যাণ্ডিং অফিসার হয়ে আগামী মহাযুদ্ধে যোগদানের মহৎ সংকল্পও তার রয়েছে! এছাড়াও, সে চেয়েছে, মন খানেক চিনি, কেন যে বলা যায় না। (কৃচ্ছ্রসাধনায় নিত্য তাল-তাল-সঞ্চয়ের উৎসাহী নয় বলেই বোধ হয়?) ওর উল্লিখিত অন্যান্য উপহারে তাকানো দূরে থাক, চিনির বিষয়েও মন দিতে পারা গেল না। আধসের

টাক্ চিনি যোগাড় যন্ত্র করে' ওকে দেবার আমাদের অভিপ্রায় ছিল, নাগালের মধ্যে পেলে ওর গালের মধ্যে ফেলে দেবারও অসুবিধা ছিলনা বিশেষ, কিন্তু চিনি চিনি করেও তার চাক্ষুষ পরিচয় মিললনা। যুদ্ধের রসদ্ হিসেবে, চিনি একদা কোনো অংশে ন্যূন ছিলনা, সেকথা সত্যি ; কিন্তু যুদ্ধের ঢের পরেও, চিনি এখনো যুদ্ধ করেই পেতে হয়। অগত্যা আমরা একটা ছড়িই ওকে উপহার দেব স্থির করলাম। বিকল্পে, চিনির মতই ছড়াছড়ি করবার জন্য।

এছাড়াও রঞ্জনের একটা পুনশ্চ ছিলো, একশো গজ লাল রঙের শালু, কেন যে তা কে জানে! তার এই লালসার মধ্যে একটু কমরেড্-কমরেড্-গন্ধ মিলতে লাগল। লাল নিশান উড়িয়ে বার্মা কিংবা মালয় নিশানা করে ধাওয়া করবে কি না ওই জানে! আন্দাজটা ব্যক্ত করলাম।

কল্পনা বললে, "মালয় নয়, তেলেঙ্গনা।"

আমি বললাম, "একই কথা। অভিন্ন মাল। কিন্তু এই বাজারে একখানা রুমাল মেলে না, কালোবাজারে আর লালবাজারে রেষারেষি,—এর মাঝে অতো শালু আমি পাই কোথায় ?"

"তাও আবার একশো গজ!" কল্পনা মুখ বাঁকালো।

"একশো গজের থাক্, একটা ইঁদুরের পরবার মতো কাপড় পাওয়া দায়!" আমি বল্লাম ঃ "অবশ্যি এক কাজ করলে হয়। ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলে হয়। আমাদের মঞ্জুর সঙ্গেই—"

"আর মঞ্জুকে একটা লাল শালুর ব্লাউজ উপহার দিলেই চলে যাবে।"

"হ্যাঁ। আর তেলতেলে একটি অঙ্গনা পেলে আপাততর মত তেলেঙ্গনার ক্ষোভ হয়তো ওর মিটতে পারে।"

কিন্তু মঞ্জুকে কনের বেশে সাজিয়ে রঞ্জনকে কোনঠাসা করা, সমস্যার দিক থেকে, একশো গজের শালুর চেয়ে কম নয়! কাজেই, রঞ্জনের ছড়িটা লাল রঙের ফিতায় জড়িয়ে হোমিও-প্যাথিক ডোজের লাল ঝাণ্ডা বানিয়ে দেয়াই ঠিক হোলো।

"উঃ, কী ঝক্‌মারি! কী হয়রান-পরেশান্!" নির্বাচনদ্বন্দ্ব শেষ হলে হাঁপ ছাড়লাম আমি : "ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা জানতে কী ধকল্‌টাই না গেল আজ।"

বাস্তবিক, স্বেচ্ছাতন্ত্রলাভের আশ্বাস দিয়ে, এবং বানাতে বলে, অবশেষে নিজের মৎলবমাফিক, সাবেকী মাল গছিয়ে দেয়ার এই আমীরি চাল আমার ভালো লাগেনা।

"কেন, ওদের ইচ্ছেটা জানায় লোকসানটা কী হোলো?... ওদের ইচ্ছা যে আমাদের ইচ্ছারই প্রতিচ্ছায়া, তাই কি জানা গেল না?" কল্পনা বলে।

"ওদের আর আমাদের ইচ্ছা একেবারে অভিন্ন, তাতে আর ভুল কী?" কথাটা আমাকে মেনে নিতে হয়। "কিন্তু এর জন্য ওদের ইচ্ছা না জানলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।"

"ক্ষতি ছিল না, বলো কি তুমি? যেসব জিনিস ওদের অবশ্যজরুরী, না পেলেই নয়, তা কি আমরা তাহলে আন্দাজ করে দিতে পারতুম? যেমন ধরো, মঞ্জুকে সিল্কের রুমাল, মামাবাবুকে সিগ্রেট, সৌম্যকে গল্পের বই, রঞ্জনবাবুকে ছড়ি—এসব দেয়া যেত কি করে'? নিজের ইচ্ছামত খেয়ালমতো যাখুশি দিতে গেলে কী দিতুম ভেবে ছাখো দিকি! য়্যাতো দিয়েও অসন্তোষ সৃষ্টি করা হোতো কেবল বইতো না।"

"কী দিতুম? মঞ্জুকে রুমাল, মামাকে সিগ্রেট, রঞ্জনকে ছড়ি আর সৌম্যকে গল্পের বই। এ ছাড়া আর কী?"

"কিন্তু তাহলেও," কল্পনা উস্‌কে ওঠেঃ "আমারটাই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এটা তুমি নিশ্চয় মানবে। তাছাড়া, এই সাধারণতন্ত্রের যুগে, ভারতের অহিংস পথে স্বাধীনতা লাভের পরে—এই প্যাটার্ণ টাই চালু এখন।"

দ্বিতীয় পর্ব

বাক্য

টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরে' সভয়ে অভ্যর্থনা করি ঃ "হ্যালো !"

একটা আওয়াজ ঃ "এটা কি হগ্ সাহেবের বাজার ?"

আমি ঃ "হ্যাঁ, বলুন্। কী চাই বলুন্?"

উক্ত আওয়াজ। আমার কতকগুলো ডিমের দরকার ছিল।

আমি। কি বল্লেন ? সীমের দরকার ? আজ্ঞে, এটাতো তরকারির বাজার নয়। আমাদের হচ্ছে চুড়ির দোকান।

উক্ত আওয়াজ (কিঞ্চিৎ বিস্মিত)। চুরি ? চোরাই কারবারের কথা বল্ছেন ?

আমি। আজ্ঞে না। চুরি করা নয়, চুড়ি পরার ব্যাপার। এখান থেকে হকাররা চুড়ি কিনে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করে—বাড়ী বাড়ী চুড়ি পরায়। আপনি কি কোনো ফেরিওলা ?

উক্ত আওয়াজ। ননসেন্স!

আমি। কি বল্লেন—রাজী আছেন? তাহলে আবেদন-পত্র হাতে চট্‌পট্‌ চলে আসুন। কিন্তু একটা কথা, আপনার চেহারাটা কি রকম? চুড়ি ফিরি করা যার তার কর্ম নয় মশাই! চেহারাটা একটু ছিম্‌ছাম্‌—চলনসই হওয়া চাই। বেশ স্মার্ট হওয়া দরকার। একটু ফিটফাট থাকাও বাঞ্ছনীয়। নইলে, যার তার হাতে মেয়েরা চুড়ি পরতে চাইবে কেন? পাণি-গ্রহণের ব্যাপার, বুঝতেই তো পারছেন!

উক্ত আওয়াজ (অতিশয় রাগত)। ড্যাম্‌ ইওর্‌ চুড়ি।

আমি। তা যা বলেছেন! তবে কিনা, সাধারণতঃ দুপুর বেলার দিকেই যা কাজ—সে সময়টায় বাড়ির কর্তারা সব বাইরে থাকেন কিনা! রবিবারটা বাদ—বিল্‌কুল্‌ বর্‌বাদ্‌! সেদিন ছুটির দিন, বুঝতেই পারছেন,—কর্তারা বাড়ি থাকেন সেদিন। সেদিন আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার অন্যান্য কাজ-কম্মো—

উক্ত আওয়াজ (উদ্ধত কণ্ঠে)। চোর কাঁহাকা!

আমি। স্বচ্ছন্দে! রোববার দিন চুড়ির কারবার বন্ধ। সেদিন চুড়ি নিয়ে কোনো মেয়েকে পীড়াপীড়ি করতে আমরা বলব না! সেদিন আপনার পকেট-কাটার কাজ অনায়াসে

আপনি করতে পারেন। অন্য চুরিও চলতে পারে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

উক্ত আওয়াজ (আহত গলায়)। কে চেয়েছে চুরি করতে? শুনি?···

ভালো জ্বালা হয়েছে সকাল থেকে! এই টেলিফোনের ঝালাপালা!

এর মধ্যে সাতটা রঙ্‌ নম্বরে সাড়া দিয়েছি। খবরের কাগজটাও পড়ার ফুরসৎ পাইনি। তখন থেকে রিসিভার হাতে তটস্থ রয়েছি—হাত থেকে নামাতে না নামাতে আরেক হাঁক্ এসে হাজির।

রোজ রোজ এই রঙচঙে জীবন দুর্বহ—বাস্তবিক! এর কবল থেকে মুক্তি পেতে টেলিফোন, কিংবা, এই বাড়ি, কিংবা এই নশ্বর দেহ, কোনটা পরিত্যাগ করব ভেবে পাই না। যত রাজ্যের রং নম্বর আমার লাইনে রপ্তানি করার কী মানে? তাই আমি ভাবি।

টেলিফোন্-অপারেত্রীর আমার প্রতি এমন জিঘাংসাবতী হবার হেতু কি? আমি তো কোনোদিন···কি বলে গিয়ে··· ভুলেও ওদের কারো কোনো অনিষ্ট করেছি বলে' মনে পড়ে না!···ওদের মধ্যে কোন্ মেয়েটি?···

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং-ি-ি-ি-ি-ি-িং—

—এঃ! আবার—আবার সেই কামানগর্জন! আরেক দফা come-on-হাঁক!

তাহলে এই নতুন ধরণের রঙের খেলাটা শুরু করা যাক্। 'তুজনে যেথায় মিলেছে সেথায়'—সেইখানেই তো জগতের যতো রঙ—সব wrong doing—এমনকি, টেলিফোন্-লাইনের তুধারে মিললেও।

আমার সদ্য-উদ্ভাবিত এই রঙের খেলা আসল রঙের তুরুপ্! এই রঙ্দার মজাটা এইমাত্র আমার মাথা ঘামিয়ে বার করেছি। মরিয়া হলে মানুষ কী না করে? আত্মরক্ষা করা বেশি কি, অপরকে মারতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

তবে আমার এই উদ্ভাবনা নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ঠিক নয়, একথাও খাঁটি। আত্মরক্ষা একে বলা যায় না। আত্মত্যাগই বলা উচিত, তবে কিনা এক পক্ষের নয় কেবল—এক ফাঁসিতে তুজনের—একত্র আত্মাহুতি। রঙের দিনের দোললীলায় ডবোল্ ঝুলনযাত্রা! আমার এই প্রয়াস সহমরণ-প্রথার নামান্তর।

আপনারা একে ভদ্রতার পরিপন্থী বল্বেন। অসামাজিক আচারও বলতে পারেন। শোভন হয়ত নয়,—এ কার্য, যুদ্ধ এবং ভালোবাসার মতই, অসভ্যতার আরেক রূপ হয়ত। কিন্তু তাহলেও, আমি নাচার। অবস্থাবিপাকে বাধ্য হয়ে এহেন আচরণ আমায় করতে হচ্ছে, মাপ করবেন।

এছাড়া অন্য কোনো পথ আমার ছিল না। সমস্ত কল্ যেমন আমার লাইনের জন্যে বাঁধা, তেমনি আমিও সেখানে

বন্ধক রয়েছি। সকাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টা; রাত দুটোতেও আমার কামাই নেই। সদ্য-আবিষ্কৃত এই অপচেষ্টার দ্বারা নিজেকে খালাস করতে পারব কি-না জানিনে, তবে—তবু—আমার বহুদিনের অবরুদ্ধ—রাগের যত অব্যয়-রূপ—অনুরাগ—বিরাগ—উপরাগ—অপরাগ এবং অন্যান্য রাগ-রাগিণী—সব এক সঙ্গে খোলসা করতে পারা যাবে!

দুরু দুরু বুকে রিসিভারের দিকে এগোই। ম্যাচ্ খেলায় আমি তেমন পোক্ত নই। ছেলেবেলায় ফুটবল ম্যাচে একবার পা ভেঙেছিলাম—নিজের পা—তাও আবার নিজের গোলে স্যুট্ *করতে গিয়ে—নিজের* কৃতকার্যতায়। দলের খেলোয়াড়দের আক্রোশে অন্য পাটাও যায়-যায় হয়েছিল,—গিয়েছিলই প্রায়, আমাকে নিয়েই চলে গেছল,—যদি না অন্যরা এসে—এক-গোলে-বিজয়ী অপর-পক্ষরা মাঝখানে পড়ে ভূমিশয্যা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে' সদ্যলব্ধ শীল্ডের সাথে আমাকে কাঁধে করে' জয়ধ্বনি দিতে দিতে না নিয়ে যেত তাহলে কেবল পদচ্যুত নয় পৃথিবীচ্যুতই হয়েছিলাম!

কিন্তু এই টেলিফোনের ম্যাচে নিজে গোল খেলে চল্‌বে না—অন্যকে গোলে ফেল্‌তে হবে। 'না মশাই, বেঠিক নম্বর, আমরা নই,' এ-বার্তা দেয়া দস্তুর হবেনা, বরং আসল

নম্বরের ভাণ করে'—উত্তর-প্রত্যুত্তরে যদ্দূর সম্ভব সঠিকতা বজায় রেখে ভুলের জের টেনে অন্যকে জেরবার করতে হবে। তার সমস্ত গোপন কথা,—গুপ্তরহস্য জেনে নিয়ে—শাঁসজল বার করে' নারকোলের মালার মতো তাকে টেনে ফেলে দাও যার কোলে খুসি! টেলিফোনের প্যাঁচে ফেলে তার সময় বরবাদ করো: কাজটা খুব ভালো নয়, গর্ববোধ করবার মত না, তবে বিবেকের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করতে পারলেই করা যায়। আনন্দের সহিত করা যায়। এবং একবার, কর্ণলজ্জার মাথা খেয়ে শুরু করতে পারলে রোমাঞ্চকর উপন্যাসের রহস্যাবৃত সম্ভাবনার মতো, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে, অপ্রত্যাশিত কত কী-ই না ঘটতে পারে!—

এই পর্বের গোড়ার অংশটি ঐ ধরণের একটি রঙিন বাক্যালাপ, টের পেয়েছেন বোধ করি? ভদ্রলোক ক্ষুব্ধস্বরে জিগেস করেন—কে চেয়েছে চুরি করতে, শুনি? কে চেয়েছে? কে?

তাঁর আঘাতলাভে আমি আহত হই, আমিও ব্যথা পাই। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের সেই বিজাতীয় গানটা আমার মনে পড়ে: 'রঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে!' এই বাড়ি ছেড়ে, এই পাড়া ছেড়ে, চিরদিনের মত টেলিফোন ছাড়া হয়ে চলে যাবার আগে সমস্ত রঙরঙে করে' দিয়ে

যেতে হবে। ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পারা যায় না।···

আমি। কে চায় না? অনেক বড় বড় বাড়ির ছেলে —অনেক মিত্তির বোস চকর্‌বর্‌তি—বড়লোক মেজলোক ছোটলোক—আমাদের ফিরির ফিকিরে জড়িত আছেন, খবর রাখেন? আপনি তো ভারি! কাজখানা কেমন! চুড়ি পরানোর সাথে সাথে মনচুরি পর্যন্ত হতে পারে—তা জানেন? অবশ্যি পরাতে জানা চাই! নরম নরম হাত—আর হাতে হাতে লাভ! একেবারে নগ্‌দা নগ্‌দি। বলি, ওমর খৈআম পড়েছেন? 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক্'··· ?

উক্ত আওয়াজ (কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে)। জানেন আমি একজন অধ্যাপক? আমার বয়েস পঁয়ষট্টি বছর?

আমি। তাহলে পঁয়ষট্টি দিন! কোনো আশা নেই আপনার। আপনাকে আমাদের দরকার নেই। কোনো মেয়েই আপনার সঙ্গে চৌর্য-বৃত্তিতে লিপ্ত হবে না।

ঐ আওয়াজ (খুব হতাশাক্ষুব্ধ)। তাহলে উপায়? আমার যে এক ঝুড়ি ডিমের বড্ড প্রয়োজন ছিল।

আমি। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। আমাদের পাশেই মার্কেটের এনকোয়ারি আফিস—তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিচ্ছি আপনার। তাঁদের কাছেই খোঁজ পাবেন সব।

সেই আওয়াজ (অত্যন্ত বাধিত)। আঃ, বাঁচালেন! ধন্যবাদ!—

আমি (এ-ঘরে ও-ঘরে দুচার চক্কর ঘুরে এসে অন্য খাদের গলায়)। হ্যালো, হ্যাঁ, পাবেন বইকি! কুকুরের গলার বগ্‌লস্‌ও পাবেন। তবে একটু খোঁজাখুঁজি করতে হবে—এই যা। নইলে হগ্‌সাহেবের বাজারে কী না মেলে!

সেই আওয়াজ। বগ্‌লস্ নিয়ে আমি কী করব? আমাদের বাড়িতে আজ একটা ছোটখাট ব্যাপার ছিল—খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার—

আমি। কুকুরের মাংস? ভোজের জন্যে কুকুরের মাংস? না মশাই, মাপ করবেন, এ-মার্কেট থেকে ও-জিনিস সরবরাহ করা হয় না! একটা স্বদেশী কুকুর, পাঁঠার চেয়ে দামে সস্তা কিনা বলা কঠিন, তবে, আমরা ওবিষয়ে অপারগ। মাপ করতে হবে।

সেই আওয়াজ। কুকুরের মাংস কে চেয়েছে? আমার দরকার এক ঝুড়ি ডিম—! ডিম? বুঝেছেন? সীম নয়, ডিম। বগ্‌লস্ নয়, খাবার জিনিস। খাবার জিনিস—কিন্তু সীম নয়।···সীম আমরা বহুৎ খেয়েছি।

আমি। কি বললেন? হিমসিম খেয়েছেন? হিমসিম যে

খাবার জিনিস তা আমাদের জানা আছে, কিন্তু আপাততঃ আমরা তা খেতে রাজী নই।

সেই আওয়াজ। আঃ, কী মুস্কিল!

আমি। আপনার কোথায় যে খট্‌কা লাগছে আমি বুঝতে পারচিনে। আমার একজন ওপরওলাকে ডেকে দেব? আজ্ঞে? তাই দিচ্ছি। ততক্ষণ একটু ধরে'—বসে থাকুন।

আমি (খানিকক্ষণ এধারে ওধারে বেড়িয়ে চেড়িয়ে ফিরে এবার একটু হেঁড়ে গলায়) হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—

উক্ত আওয়াজ। আমি কতকগুলি egg চাই। এগ্‌স্‌।

আমি। লেগ্‌স্‌?

সেই আওয়াজ (একটু হক্‌চকানো)। য়্যাঁ?

আমি। লেগ্‌স্‌ চাই আপনার? বেশত, ক' জোড়া চাই বলুন? টাকা ফেল্‌লে কী না পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলকাতায় আর এই হগ্‌মার্কেটে! তা, কি রকম লেগ্‌স্‌ চাই বলুন—ছেলের, না, বুড়োর, না,—

উক্ত স্বর প্লুতস্বরে বাধা দিয়ে কী বলে বোঝা যায় না।

আমি। লেগের ভাবনা কি? যতো দরকার,—এন্‌তার যোগানো যায়। এদেশে সবই তো লেগ্‌স্‌ মশাই, মাথা আর কই? আমরা ফর্টি ক্রোর্‌স্‌ অব্‌ হেড্‌স্‌ না বলে' এইট্টি ক্রোর্‌স্‌ অব্‌ লেগ্‌স্‌ বল্লেই খাঁটি সেন্সাস্‌ দেয়া হয় না কি?

কিন্তু একটা কথা, প্রত্যেক জোড়া পায়ের সঙ্গে একটা করে' মাথা আপনাকে নিতে হবে। মাথার জন্যে অবশ্যি দাম লাগ্‌বে না, ওটা অম্‌নি, ফাউয়ের মধ্যেই ধরতে পারেন।

ঐ আওয়াজ (আর্ত স্বরে)। মাথার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?

আমি। সম্পর্ক থাক্ বা নাই থাক্, আমরা পা থেকে ছাড়িয়ে আলাদা করতে পারব না। পা আর মাথা পৃথক্,—সে আপনার নিজের করে নিতে হবে—আমরা পারব না। দেশের আইনে বাধে কিনা! যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র ও কর্ম গর্হিত বলেই গণ্য—ওকে নাকি খুন্ বলা হয়। আইনের এই ব্যবস্থা। অন্যায় ব্যবস্থা বলতে পারেন, কিন্তু আমরা তো আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করিনি। এখনো করিনি। করবার কোনো নির্দেশও পাইনি কংগ্রেস থেকে।

ঐ আওয়াজ। কী সর্বনাশ!

আমি। তা যা খুশি বলুন। ফাঁসিকাষ্ঠে পা বাড়াতে পারব না—আমাদের এই শর্তে রাজী থাকেন তো, অর্ডার দিন, যতো ডজন আপনার লেগ্‌স্ দরকার এই দণ্ডেই যোগাচ্ছি। বয়েজ্—অ্যাডাল্‌ট্‌স্—অ্যাডাল্‌টারেটেড—যেরকমের লেগ্‌স্ চাই। হ্যাঁ, ভ্যাজাল পাও পাওয়া যাবে—একখানা কিংবা দেড় খানা কাঠের পা—তাও আমরা সরবরাহ করতে পারব।

ঐঃ আঃ। হরিব্‌ল্!

আমি। দামের কথা বল্‌ছেন? তা, দামটা এখন ঠিক ঠিক বল্‌তে পারছিনা; আসল পার চেয়ে কেঠো পা'র দর বেশি পড়বে কিনা বলা কঠিন। যাক্‌, সে আপনি বিলের সময় টের পাবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লেগ্‌সের দর একটু বেশি। বোধহয় আদর বেশি বলেই। গ্রোন্‌-আপ্‌-মেয়েলী পা'র আরো বেশি চাহিদা। দামও একটু—হেঁ হেঁ—একটু বেশিই বই কি!

ঐঃ আঃ। যথেষ্ট! যথেষ্ট! খুব হয়েছে! আর আমি শুনতে প্রস্তুত নই। আপনার ওপরওয়ালা কর্মচারী যদি আর কেউ থাকেন অনুগ্রহ করে তাঁকে ডেকে দিন।

আমি। তাহলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকুন খানিক। খোদ্‌ মার্কেট স্থপারিণ্টেনডেণ্টকেই খবর পাঠাচ্ছি। তিনি অবশ্যি আমার চেয়ে আরো ঢের বেশি খবর রাখেন।

ঐঃ আঃ। তাহলে তাঁকেই খবর দিন। ধন্যবাদ!···উঃ···

আমি বেরিয়ে গিয়ে চা খেয়ে সেলুনে দাড়ি কামিয়ে চুলচর্যা সেরে আরেক কাপ্‌ চা খেয়ে আরো কিছু চাঙ্গা হয়ে আধ ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরে আবার—CALL-কারখানায় যোগ দিই।···"হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো" বেশ কড়া গলায় হাঁক ডাক ছাড়ি এবার।

উক্ত স্বর (থতমত খাওয়া)। ওঃ, হ্যালো,—আপনি সুপারিণ্টেডেণ্ট? মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করতে হোলো! কষ্ট দেবার জন্য মার্জনা চাচ্ছি। দুঃখের বিষয়, আপনার বাজারের একজনও আমাকে ডিমের খবর দিতে পারল না।

আমি (হৈ-হৈ করে')। ডিমের খবর? কেন, আজকের স্টেট্স্ম্যানেই তো আছে। আর স্টেট্স্ম্যনই বা কেন—সব কাগজেই তো আছে—প্রত্যহই বেরয়। আজকালকার যা কিছু খবর সবই তো মশাই, ডিমের খবর। ঘোড়ার ডিমের খবর সব। যাক্, নমস্কার, আপনার সঙ্গে আলাপ করে' ভারী খুশি হলাম। নমস্কার!

ম্যাচের ইন্টারভ্যালে ক্লান্তদেহে বিছানায় এসে লম্বা হয়ে পড়েছি। ভালো করে সটানও হইনি, আবার ফের ক্রিং ক্রিং ক্রিং! স্খলিত পায়ে টলিতে টলিতে গিয়ে রিসিভারের হাতে ধরা দিই। একটু আগে কড়া গলার পার্ট্ হয়ে গেছে, এবার একটু মিঠে গলায় শুরু করা যাক্। মৌমাছি-নিন্দিত মিহি সুরে আরম্ভ করলাম: "হ্যালো, কাকে চাই বলুন?"

"রাজশেখর বাবু কি বাড়ি আছেন?···আপনি—আপনি তাঁর কে?"

"আমি ? আমি তাঁর ভাগ্‌নি।"

কে রাজশেখর বাবু এবং কোন্ রাজশেখর বাবু যতক্ষণ না সম্যক্ বিদিত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর ভাগ্‌নিরূপেই বিরাজ করা যাক্।

"ও! আপনি তাঁর ভাগ্‌নি? আপনি ভাগ্যবান্! আই মীন্—ভাগ্যবতী। আমি আপনার মামার যে কী দুর্দান্ত ভক্ত কী বল্‌ব! ওঁর লেখা আমার দারুণ ভালো লাগে। কি করে' লেখেন কে জানে, কিন্তু কী ভালোই যে লেখেন!"

এতক্ষণে বুঝলাম, পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বাবু! পরশুর থেকে আজকের রামে—অদ্যকার আরামে অনেকখানি তফাৎ! মাঝখানে গোটা গতকল্যটাই বাদ। তবু নিজের সৌভাগ্যে যদ্দূরসম্ভব গদ্‌গদ হয়ে জানাই: "এবিষয়ে আমরা একমত। যদিও আমাদের মামা, তবু আমরাও তাঁর কিছু কম ভক্ত নই। ডেকে দেব তাঁকে?"

"তাঁকে ডাকবেন? তাঁকে আরর কেন ডাক্‌বেন? তিনি কাজের লোক—তাঁর বাজে সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমার—আমার তো কোনো কাজের কথা না, আমার হচ্ছে কথার কাজ। আপনিই দয়া করে' তাঁর কাছ থেকে জেনে আসতে পারেন।"

"কী জান্‌তে হবে বলুন্?"

"দেখুন, আমি একজন লেখক। লিখ্‌তে লিখ্‌তে

একটা বানানে আমার আট্‌কেছে। সেই বানান্‌টা জানার জন্যই কলম ছেড়ে ফোনে হাত দিয়েছি।"

"কিসের বানান্?" আমারও ফণায় হস্তক্ষেপ—কেউকেটা নয়, এক কেউটের। সাক্ষাৎ একজন লেখকের!

"জরি বানান্‌টা কি, জানা দরকার। ব-য়ে শূন্য র, না ড-য় শূন্য ড়। আমার গল্পের নায়ক জরিপাড় কাপড় পরেই মুস্কিল করেছে। অবশ্যি, তাঁর কাপড় খুলে নেওয়া যায়না যে তা নয়—"

"না না। তা করবেন না। তাতে কাজ নেই। সেটা ভালো হবে না। খুব বিসদৃশ হবে। মেয়ে হলে বরং তা—কিন্তু—সে কথা থাক্! আমি এক্ষুণি জেনে আস্‌ছি—দাঁড়ান্।" বাধা দিয়ে আমি বলি।

"যদি তেমন অসুবিধা হয় কাপড় খুলে হাফ প্যাণ্ট পরিয়ে দেব না হয়, তার কী হয়েছে?"

"আচ্ছা, আপনি একটু ধরে থাকুন। এলাম বলে'।"

ইতিমধ্যে পাশের বাড়ির একটি বালকের সঙ্গে পাশ্চাত্য সমরকৌশল নিয়ে মিনিট পনেরো কূটতার্কিক আলোচনা চালিয়ে—তার মতে, উক্ত রণনীতি সংক্ষেপে একটি সংস্কৃত কথার একান্ত অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়ঃ 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই চল্‌তি সংস্কৃতির পদাবলী সংস্করণ—ধাবমান পাদটিকা মাত্র। সাদা বাংলায়, রানিং ফুটনোট। এবিষয়ে ওর বাক্-

বিতণ্ডার যার পর নাই প্রতিবাদ করে' ফের টেলিফোনের খর্পরে ফিরে আসি। যথাসাধ্য রাজশেখর বাবুর মত গলদেশ করে' হাঁ কি—'হ্যালো'!

"ও! আপনি! রাজশেখর বাবু? আমার কী সৌভাগ্য!"

"হ্যাঁ, শুনুন্। বানানটা তো আমি অফ্হ্যাণ্ড্ বল্তে পারছিনে। আমার চলন্তিকাখানাও এখন হাতের কাছে নেই। আপনি এক কাজ করুন্ বরং।"

"বলুন্—বলুন্!" ব্যগ্র স্বর।—"যা বলবেন করব।"

"যা খুশি একটা 'র' বসিয়ে যান্। কখনো ব-য়ে শূন্য কখনো বা ড-য়ে শূন্য—যখন যেটা মর্জি বা যেখানা হাতের কাছে এসে যায় তাকেই বসান্।"

"কিন্তু তাতে কি ভুল হবে না? একটা তো ওদের ভুল নিশ্চয়ই?"

"ভুল তো বটেই। সেই জন্য ওদের ঘাড়ে, এক কাজ করুন্, একটা করে' চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দিন্। তা হলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।"

"চন্দ্রবিন্দু? চন্দ্রবিন্দু কেন?" কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

"তাহলে অন্ততঃ অর্ধেক বাংলার ভোট্ তো আপনি পাবেন। সারা প্রাচ্য বাংলার। ভুল হলেও তারা ভোট দেবে। আর ভোটারি থাক্তে আপনার ভয় কি মশাই? বইয়ের কাট্তি নিয়ে কথা, তা হলেই হোলো।"

"কিন্তু ও-ছাড়াও আরেকটা সমস্যা আছে যে। সাবাস্ কথাটা তোসংস্কৃত নয়—ওটায় আমি তালব্য শ ব্যাভার করলে কি—"

"খুব দুর্ব্যবহার হবে। তার চেয়ে ওর স-স্থানে দু'জায়গাতেই—ছ আদেশ করে' দিন্। তাহলে বাকী বাংলার—পাকিস্তানী আধখানার—হাততালি আপনার একচেটে রইল। আর কি চাই ?"

"ছাবাছ্ বল্ছেন ?"

"হ্যাঁ, ছাবাছ্! আচ্ছা, নমছ্কার! আছি তবে।"

অদৃশ্য লেখককে উৎসাহ দিয়ে, নিজের বিছানায় ফেরৎ এসে—একেবারে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কপালে কল-ঙ্ক থাকলে রেহাই কোথায় ? কলিযুগ খতম্ হয়ে এখন কলের যুগ, এবং টেলিফোনের কলেই তার কাকলি! কাজেই একটু বাদেই আবার সেই কলকলোচ্ছ্বাস।

এবার চৌকিটাকে টেলিফোন্-রিসিভারের কাছে টেনে নিয়ে আসি। তারপর শুয়ে শুয়েই কলধ্বনিতে কান দিই।

"এটা কি বুকিং আফিস্ ?" এবার ওধার থেকেই বীণা-বিনিন্দিত আওয়াজ পাওয়া যায়! আমাকে শশব্যস্তে পাশ ফিরতে হয়।

"কিসের বুকিং ?"

"রূপ্মহল থিয়েটার কি এটা ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।" অম্লানবদনে ধরা দি

"আস্‌ছে রবিবার ম্যাটিনির দুটো সীট্‌ দিতে পারেন আমায় ?"

"পারি বই কি। একটু দাঁড়ান্‌, প্ল্যান্‌টা দেখে নিয়ে বলি।...হ্যাঁ, পারি। একটা সীট্‌ হবে গ-বর্গে ; স্টেজ থেকে থার্ড রো-য়ে, বুঝেছেন ? সেখান থেকে স্টেজের দৃশ্য অতি সুচারু। আরেকটা সীট্‌ পাবেন আর একটু পিছনে। একেবারে থ-বর্গে। সেখান থেকে স্টেজের ঘটনা একটু সুদূর পরাহত মনে হলেও কিছু কম উপভোগ্য নয়। সুদৃশ্যই বলা চলে, তবে সুশ্রাব্য কিছু কি না বলতে পারি না।

"দুটো পাশের সীট্‌ হয় না ?"

"পাসের সীট্‌ ? না, পাস আজকাল বিল্‌কুল বন্ধ।"

"না না, পাসের কথা বল্‌ছিনে। দুটো সীট পাশাপাশি হয় কি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"পাশাপাশি সীট্‌ কেন চাচ্ছেন জানতে পারি ?"

কিছুক্ষণ কোনো সাড়া নেই। মেয়েটি যেন এখনই থ-বর্গে গিয়ে পড়েছে মনে হয়। একটু পরে আম্‌তা আম্‌তা করে' বলে : "আমরা দুজন যাবো কিনা, দুই বন্ধুতে।"

"নিশ্চয় কোনো পুরুষ বন্ধু, অনুমান করি ?" আমার পরুষ কণ্ঠ।

আবার চুপ্‌চাপ্‌। ধাক্কাটা সাম্‌লে মেয়েটি অর্ধস্ফুট স্বরে বলে :

"এখনো পুরোপুরি স্বামী হন্‌নি বলেই বন্ধু বলেছি। নইলে—নইলে—" বল্‌তে বল্‌তে সে থেমে যায়।

"নইলে স্বামীত্বে ওঁর কোনো কসুর নেই।—এইতো বল্‌তে চাচ্ছেন?" আমার বলা।

মেয়েটি নীরব।

"যাক গে, সেবিষয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ? উনি স্বামীর যুপকাষ্ঠে যাবেন, কি, শেষে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন—তা আমাদের কি? তা আমাদের দেখবার নয়ঃ এরকম ক্ষেত্রে পাশাপাশি সীট্‌ দিতে আমরা অক্ষম। কেননা, সুনীতি বজায়ের দিকটাও আমাদের দেখতে হবে তো। থিয়েটার খুলেছি তো কী! সমাজের প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই? ওধারে আবার সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা আছেন, শনিবারের চিঠিও রয়েছেন—তাঁদের অমান্য করা যায় না।"

"কিন্তু ধরুন্‌, থ-বর্গে আমার সীটের পাশে—?" মেয়েটি বল্‌তে গিয়ে ফের থতমত খায়।

"হ্যাঁ, দু' পাশেই দুজন পুরুষ পাবেন। কিন্তু তাঁরা আপনার অচেনা পুরুষ। একবারে আন্‌কোরা পরপুরুষ। তবে তাঁরা ভদ্রলোক নাও হতে পারেন।"

"তাহলে?—" মেয়েটি তার বক্তব্যকে যেন বিশদ করতে পারে না।

"কেন দেখতে আসছেন? আড়ালে বলি আপনাকে,

যাচ্ছেতাই বই। নোংরা ব্যাপার। পচা সব সিনারি। অনর্থক পয়সা নষ্ট আর সময়ের বাজে খরচ। বাসি বিলিতি নাটকের অতিশয় বাজে নকল—আর অভিনয় এত রাবিশ যে বলা যায় না। তার সঙ্গে সীট্-ভর্তি ছারপোকা। তারপরে পান-বিড়িওয়ালার চীৎকার। অবশ্যি, ক্ষতিপূরণস্বরূপ মাঝে মাঝে এক আধটু নাচগান আছে বটে, কিন্তু তাও আবার অতি আধুনিক ম্যারপ্যাঁচের—অর্থাৎ নাকি কান্নার সঙ্গে তুড়ি লাফ! মানে হয় না, রাগ হয়। মোটেই সুবিধের নয়। তবে কিনা, এ সমস্তই কিস্তিবন্দী—একটানা অসহ্যতা না—কিন্তু ছারপোকাটা আগাগোড়া! তার চেয়ে রবিবারের দুপুরটা আরাম করে বাড়িতে শুয়ে ঘুম লাগান্—কিংবা পাড়াপড়শীর সঙ্গে ঝগড়া করে' কাটিয়ে দিন্। ঢের সার্থক হবে।"

শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে রিসিভার-রক্ষার অপচেষ্টায় চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়তে কোনরকমে বেঁচেছি। আধ ঘণ্টাও বাদ যায় নি, আবার সেই কলকল-নিনাদ! শুয়ে শুয়েই হাত বাড়াই—চৌকি এবং আত্মরক্ষা করে' কর্ণক্ষেপ করি আবার।

ওধার থেকে আওয়াজ আসে—হ্যালো! এধারে, বিছানায় শুয়ে হেলাভরে শুনতে গেলে যা হয় তার চূড়ান্ত করে' জানাই : হ্যাঁ, হেলেছি। বলো। বলে' ফ্যালো।

অপর ব্যক্তি (কেজো লোকের মত তাড়াহুড়ায়)। হ্যালো! দেবতোষ? তুমি?

আমি (দৃঢ়তার সহিত)। দেবতোষ বাবু পাশের ঘরে। ধরে থাকুন, তাঁকে ডেকে আন্‌ছি। কে ডাকছেন বলবো?

অ-ব্য। কিছু বল্‌তে হবে না। বল্‌লেই হবে।

আমি (আরো সুদৃঢ় হয়ে)। আপনি কে বলুন?

অ-ব্য। কী পাপ! বলোগে হরিহর।

আমি (বেশ কিছুক্ষণের অনিবার্য বিলম্বের পর)। হরিহর, কি খবর?

অ-ব্য। উঃ' এত দেরি! পাশের ঘর থেকে পৌঁছুতে বুড়িয়ে গেলে যে হে! শোনো—বোর্ডের মিটিংএর কথাই বল্‌ছি। ব্যালেন্স শীট্ সব তৈরি তো?

আমি। সেই কর্মেই তো এতক্ষণ ধরে ব্যস্ত ছিলাম!—

অ-ব্য। ও! ভালো! শোনো। দেবেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মিলের শেয়ারগুলো এই বেলা আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি। এরপর যত চট্‌পট্ পারা যায় লালবাতি জ্বালতে হবে। কোম্পানিকে লিকুইডেশনে দিয়ে তারপরে আমাদের অন্য কাজ।

আমি। পাজি! বদমাইস কোথাকার!

অ-ব্য। কী বল্লে?

আমি (নির্দোষ সেজে)। কই, আমি তো কিছু বলিনি।

বোধহয় কেউ আমাদের লাইনে জড়িয়ে পড়েছে।—(একদম্ হতচ্ছাড়া গলায়) এই উল্লুক !……মিঁয়াও !……ম্যাও !

অ-ব্য (অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে)। মশাই, শুনছেন ? লাইন্‌টা ছেড়ে দেবেন দয়া করে' ?…এটা বেড়াল ডাকবার জায়গা নয় ! হ্যালো ! হ্যালো !…যাক্, আপদটা চলে গেছে। ভালো কথা, ভুলো না যেন। হ্যাঁ, কাল রাত্রে এলে না কেন হে ? আমার নতুন আলাপিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম।

আমি। কোন্‌টি বল তো।

অ-ব্য। আমার নতুন পাত্রী ! একে তুমি ছাখোনি এর আগে, কুমারী মঞ্জু সেন। আন্‌কোরা গ্ল্যাক্‌সো—কারও হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়।

আমি। ও, তোমার আরেক নতুন কোম্পানি ? লিকুইডেশনে দিয়েছ, না, দাওনি এখনো ?

অ-ব্য। য়্যাঁ, কী বল্‌ছো ?

আমি। তোমার মতে, কোম্পানি-মাত্রই তো লিকুইডেট্ করার জন্যে—তাই না ?

অ-ব্য। মঞ্জু সেন তেমন নরম মাটি নন্। অতো সহজে গলবার নয়। গলাবার না।

আমি। কোন্ মঞ্জু সেন বলো তো ? ঐ নামের

একজনের সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার—না, বল্‌ব না। ইস্কুলে পড়বার সময় ব্যাকরণ মঞ্জুষার সঙ্গে এক মঞ্জু সেনকে মুখস্থ করেছি। সেই কি? সেই-ই বোধহয়; নাঃ, সেকথা কলে' কাজ নেই। আন্‌টাচ্‌ড্‌—আন্‌-অ্যাটাচ্‌ড্‌ গ্ল্যাক্সো তো! সেস্‌ব শুন্‌লে তুমি ক্ষেপে যেতে পারো। সব কথা সবাইকে বলতে নেই। একা মঞ্জু সেনই ইন্‌সেন করতে যথেষ্ট!—আচ্ছা, মিটিংএ তো দেখা হচ্ছে, গুড্‌বাই।—

একটু বিশ্রাম নিতে না-নিতেই আবার টেলিফোন-বাছ্য।

নতুন আহ্বায়ককে সভয়ে অভ্যর্থনা করি: হ্যালো।

"চীফ্‌ মিনিষ্টারের বাড়ী?" একেবারে বাজখাঁই গলা এবার।

উত্তর দিতে দম নিতে হয়।

—"চীফ্‌ মিনিষ্টারের বাড়ী কি?"

"হ্যাঁ, ঝাউতলা হাউস্‌। বলুন।" আমি বলি।

"আমি হক্‌ সাহেবের প্রাইভেট্‌ সেক্রেধারীর সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই।" নইলে এখুনি পৃথিবীর চরম সর্বনাশ আসন্ন এম্‌নি যেন ভাবখানা।

"প্রাইভেট সেক্রেটারী এখন একটু ব্যস্ত আছেন। তাঁর আর্দালীকে ডেকে দেব?"

উক্ত ব্যক্তি (অতিশয় চটিতং)। আর্দালী! আর্দালীতে আমার দরকার নেই। ইয়ার্কি পেয়েচো? ঠাট্টা হচ্চে?

আমি। এক মিনিট্!

[অনেক অনেক মূহূর্ত চলে যায়। এর মধ্যে আমি এঘরে ওঘরে কয়েক চক্কর মেরে আসি। এতক্ষণ ধরে' আনাড়িদের পাল্লায় পড়ে খিদেয় নাড়ি চন্ চন্ করছিল, এই সুযোগে কিছু মাখন বিস্কুট আর পাঁউরুটি জেলির শ্রাদ্ধ করে' সবল হয়ে নি। তারপরে নবোদ্যমে ফিরে এসে ফের আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভিড়ে যাই।]

উক্ত ব্যক্তি (ক্ষেপে গেছেন তখন)। হ্যালো—হ্যালো—

আমি। হ্যালো! কাকে চাই?

উক্ত ব্যক্তি। হাউস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডেকে দাও—এক্ষুণি—

আমি (দূরাগত বংশীধ্বনির মতো)। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং কথা বল্‌ছেন।

উক্ত ব্যক্তি (অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করে' এবং সগর্বে)। শুনুন—আমি একজন এম-এল-এ। আধ ঘণ্টা ধরে আমি—

আমি (কোমল কণ্ঠে)। দয়া করে' অতো চেঁচাবেন না। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি নে।...হ্যাঁ, কি বলছ তোমরা বলো

তো? শাখাওয়াৎ স্কুলের মেয়েদের পক্ষ থেকে চীফ্‌ মিনিষ্টারকে বরণ করতে চাও?

উক্ত ব্যক্তি। হ্যালো—! আমি একজন—

আমি। অতো হ্যালো হ্যালো করবেন না। পাশের লোকের কথা শোনা যাচ্ছে না।···হ্যাঁ, কি বলছিলে? বরণ করার কথা হচ্ছিল, তাই না? কিন্তু ওটা কি সম্বরণ করা যায় না? চীফ্‌ মিনিষ্টারকে কি না নিয়ে গেলেই নয়? নিয়ে যাও কিন্তু দেখো যেন কোনো মিসচীফ না ঘটে! অনারেবল হক সাহেব নতুন আর কোনো কুমারীর পাণিগ্রহণ করতে অক্ষম। যেকটির বর আছেন তাই তাঁর যথেষ্ট, তার চেয়ে আর বেশি বরণীয় হতে তিনি নারাজ। হক্‌সাহেবের প্রতি যেন নাহক্‌ কোনো জবরদস্তি না হয়।

উক্ত ব্যক্তি (ক্ষিপ্ত ভাবে)। কি—হচ্ছে কী? কান দিচ্ছেন এধারে?. আমি একজন বেঙ্গল অ্যাসেম্‌ব্লির মেম্বার—এক ঘণ্টা ধরে গলা ফাটাচ্ছি—

আমি। শুনে দুঃখিত হলাম। বলুন্‌, কী বলতে চান—বলে ফেলুন চট্‌ করে।

উক্ত ব্যক্তি। কিচ্ছু বলতে চাই না আপনাকে। আপনার মত উজবুককে কিচ্ছু বলার আমার নেই। তার কোনো প্রয়োজন করে না। প্রাইম্‌ মিনিষ্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আমি টেলিফোনে পেতে চাই।

আমি। সেক্রেটারীদের মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি চান্‌?

উক্ত ব্যক্তি (চড়া গলায়)। হ্যালো! আমি খোয়াজা সার নাজিমুদ্দিনের বাড়ী থেকে বলছি—

আমি (শান্ত ভাবে)। কে খোয়া গেছে বল্লেন?

উক্ত ব্যক্তি। খোয়া নয়—খোয়াজা! সাদা বাংলায় খাজা।

আমি। খাজা! বটে! আমি খাজা? বটে বটে! খাজা বলে' আমাকে গাল দিচ্ছেন? কিন্তু আমায় গালাগাল দেবার আপনি কে? শুনি একবার?

উক্ত ব্যক্তি। (ঈষৎ নম্র হয়ে)! আহা, আপনি কেন খাজা হবেন? খাজা হতে যাবেন কেন? আপনাকে আমি খাজা বলিনি।

আমি। তবে কাকে বল্‌ছেন জানতে পারি?

উক্ত ব্যক্তি। যিনি খাজা তাঁকেই বল্‌ছি। খাজা সার—

আমি। স্পষ্ট করে' বলুন।

উক্ত ব্যক্তি। সার নাজিমুদ্দিন।

আমি। বানান্‌ করুন। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

উক্ত ব্যক্তি। N-A-Z-I-M-U-D-D-I-N

আমি। ও! আমাদের খাজা সার নাৎসিমুদ্দিন! তাই বলুন্‌!

উক্ত ব্যক্তি (হতভম্ব হয়ে)। নাৎসি! নাৎসি কেন? নাৎসি কেন বলছেন? উনি কি নাৎসি?

আমি। নতুন বানানে—আবার কেন ? এন্-এ-জেড্-আই—উচ্চারণে কী হয় ? বাংলা খবরের কাগজ পড়েন না কখনো ? তিনি কখন্ খোয়া গেছেন বল্লেন ? খুব সর্বনেশে কথা তো ! পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে ?

উক্ত ব্যক্তি। তিনি খোয়া যান্ নি, তাঁর কোনো কথাও না। তাঁর বাড়ী থেকে আমি কথা বল্‌ছি।

আমি। কী ভয়ঙ্কর লোক মশাই ! একটা দুয়ানি বাঁচানোর জন্য—সামান্য কটা পয়সার খাতিরে—অম্‌নি টেলিফোন্ করার সুবিধা নিতে অদ্দূর অবধি গেছেন ? কী সর্ব্বনেশে লোক আপনি ! ইস্ !

উক্ত ব্যক্তি (চটে' গিয়ে)। কোথাকার বেল্লিক ! জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছো জানো ? খান বাহাদুর খোদ্ আবুবকর সাহেবের সঙ্গে। তোমার এই বেয়াদবির জন্যে অ্যাসেম্‌ব্লিতে অ্যাড্‌জুর্ণমেণ্ট মোশন্ আনতে পারি তা জানো ? তুমি হক্ সাহেবের বাড়ীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই হও আর যাই হও !

আমি। আপনি যে আসল এবং অকৃত্রিম আবুবকর তা অনেক আগেই টের পেয়েছি জনাব ! এতক্ষণ আপনার বকর বকর থেকেই !

খাঁ বাহাদুর। ইয়া আল্লা ! (মিনিট দুই চুপ্ চাপ্—তারপর ধাক্কা সামলে)। হ্যালো !··· কে তুমি ?···যদি হক্

সাহেবের হাউস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হও তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো কথা বল্‌তে চাই না।

আমি (ক্ষীণ কণ্ঠে)। আজ্ঞে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে এইমাত্র কর্তা ডাক দিলেন। রিসিভার রেখে এই তো ওপরে গেছেন। ডেকে দেবো ?

খাঁ বাহাদুর। না না—একদম্ না ! চট্ করে যদি পারো এই ফাঁকে চীফ্ মিনিষ্টারের প্রাইভেট পেক্রেটারীকে খবর দাও। বলো যে খাঁ বাহাদুর আবুবকর সাহেব—

আমি। আর বলতে হবে না। আপনি কি চীফ্ প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে চান্ ? না, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে ? না, ডেপুটি চীফ্ সেক্রেটারীকে আপনার দরকার ? বিম্বা সাব অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব ডেপুটি চীফ সেক্রেটারীকে ডেকে দেব ? সব শুদ্ধ আমরা ছত্রিশ জন সেক্রেটারী রয়েছি—পরম্পরের মধ্যে আমাদের বহুৎ পার্থক্য বুঝতেই পারছেন।

খাঁ বাহাদুর (ভগ্ন কণ্ঠে)। আপনি—আপনি কে ? কোন্ সেক্রেটারী ?

আমি। সেক্রেটারীর দিক দিয়ে কিছু না। তবে বি-সি-এস-এ'র—বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের দিক থেকে আমিও একজন বৃইকি ! আমাকে সাব অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব ডেপুটি বলা যেতে পারে। আমি হক্ সাহেবের সদর দরজার হেড্ কনেষ্টবল।

খাঁ বাহাতুর। আপনার দ্বারা—আই মীন্—তোমার দ্বারা হলেও হতে পারে। তুমি হয়ত এটা পারতে পারো। ব্যাপার এই—

আমি। এক মিনিট। এই যে, চীফ মিনিষ্টার নিজেই এদিকে আসছেন! আপনি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছুক কি? তাহলে তাঁকেই বলুন্। সত্যি বল্‌তে, আমি এখন একটু ব্যস্তই আছি।

খাঁ বাহাতুর (ঘাবড়ে গিয়ে)। নিশ্চই—নিশ্চই।··· হ্যালো।

আমি (গলা পাল্‌টে)। হ্যালো।···আমি চীফ মিনিষ্টার··· হ্যাঁ···ও! আবুবকর?···তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে ভাই। মিনিট খানেক সবুর করবে? ততক্ষণ আমি আমার সেক্রেটারীর সঙ্গে কথাটা আগে সেরে ফেলি?

খাঁ বাহাতুর (একেবারে গলে' গিয়ে)। নিশ্চয়··· নিশ্চয়।···কোনো তাড়া নেই···তেমন কোনো তাড়া নেই আমার···আপনি সারুন···

খাঁ সাহেবকে তদবস্থায় ত্যাগ করে' আমি বিছানায় ফিরে আসি।

খাঁ বাহাতুরের তরফ থেকে যে টেলিফোনের আর কোনো তাড়না আসবে না তা স্থির। তিনি নিজেই নিশ্চয় করে

জানিয়েছেন তাঁর কোনো তাড়া নেই—টেলিফোনে কান দিয়ে তিনি তটস্থ থাকবেন। ঐভাবে অনন্ত কাল ধরে প্রধান মন্ত্রীর কথামৃতের অপেক্ষা তিনি করলেও আমি অবাক্ হব না।

বিছানা আমার অভাবে খাঁ খাঁ করছিল। কিন্তু শুতে না শুতেই ফের কলোচ্ছ্বাস! আবার কান খাড়া করে' দাঁড়াতে হোলো। নাঃ, আবুবকর না, হরিহরও নয়, একেবারে আলাদা খাঁড়া। তবে হ্যাঁ, কল্ দেবার মতো গলা বটে, এমন কি, শোনবার মতও বলা যায়! হ্যাঁ, কলকণ্ঠ যদি বলতে হয় তো একেই।

মধুঝরা মেয়েলী গলাই বটে।—"হ্যালো, মেঘেন বাবু—" কলকণ্ঠী মেঘেন-ভ্রমে আমাকে সম্বোধন করেন।

"কে আপনি? কোথ্‌থেকে বল্‌ছেন?"

আমিও মেয়েলী গলা বার করি একখানা। ওর বীণা-বিনিন্দিতর জবাবে আমার বিনি-বিনিন্দিত স্বর।

"তুমি? তুমি কে?" মেয়েটির স্বর বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে—ফোনের এই কূলেই এসে ভাঙে।

"মেঘেনবাবুর বোন আমি।" আমি জানাই।

"মেঘেনবাবুর কোনো বোনটোন ছিল বলে' শুনিনি তো। কিরকম বোন?" মধুঝরা গলা চাখতে না চাখতেই হুলভরা হয়ে ওঠে।

"বোন ফের কিরকম হয়? করকম হয় শুনি? বোনের ফের রকমফের আছে নাকি?" আমি জানতে চাই।

"মানে, মেঘেনবাবুর তুমি কেমন বোন? তাঁর সঙ্গে তোমার কি রক্তের সম্বন্ধ? না—কি···?" না-টা যে কী তা সে ভাষায় প্রকাশ করে' কুলিয়ে উঠতে পারে না।

"রক্তের সম্বন্ধ কি মাংসের সম্বন্ধ তা তুমি মেঘেনবাবুকেই জিজ্ঞেস কোরো না হয়। আমি তো জানি বোনের সঙ্গে হচ্ছে অস্থির সম্বন্ধ। এই আছে এই নেই—সম্বন্ধ আছে কি না তাই টের পাওয়া যায় না। সর্বদাই অস্থির! শ্বশুরবাড়ী একবার গেলেই হোলো!"

"তা বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর জন্যেই তো বোন। বোন নিয়ে কি কেউ বাস করে নাকি?"

"অন্ততঃ নিজের বোন নিয়ে তো না। বনবাসী হতে হলে—হ্যাঁ—কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও আমার তো মনে হয়, বোনের কোনো অস্তিত্বই নেই—অস্থিত্বই সার। সেখানেও, সেই বোন, একজনেরই না—অনেকেরই, যাকে বলে 'বোন্ অব্ কনটেন্শন্।' অবশ্যি, আমি সেরকম বোন কিনা তা আমি বলতে চাই না।"

"বুঝেছি, আর বলতে হবেনা।" মেয়েটির গলা মেঘলা হয়ে আসে—গুরু গরজনি শোনা যায়: "মেঘেনবাবুকে বলে' দিয়ো, একজন ফোন করছিলো সে আর ফোন করবে না।"

"আহা, আহা, চটছ কেন? রাগ করে কি? ছিঃ! আমি মেঘেনবাবুর সে রকমের বোন নই।" আমি চাটু বাক্যে চট্‌পট্‌ সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা করি। ওর উচ্চাটন দূর করতে চাই।

"মেঘেনবাবুর মার পেটের কোনো বোন কখনো ছিল বলে' জানতুম না তো!" ঘুরে ফিরে ওর মুখে সেই এক কথা। "তুমি কি ওঁর মামাতো বোন?"

"না। মামাতো বোন নই, মাস্তুত বোন নই, পিস্তুত বোন নই, কিস্‌তুত বোনও না—"

"কিসের কথা বললে?"

"কিসের কথাই বল্লাম তো! কে-আই-ডবল্‌-এস্‌—কিন্তু সে-সম্পর্কও মেঘেনবাবুর সঙ্গে নয় আমার।"

"মাগো! কী কথার ছিরি!"

"পাড়াটে বোন নই, ভাড়াটে বোনও না। ···এমন কি, 'নিজের চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে বন ভালো'—বলে' যে বনের এত প্রশংসা শোনা যায় সে-বনও আমি নই।"

"সে তো পরের বোন। পরের বোনের চেয়ে ভালো—হ্যাংলা ছেলেদের কাছে আর কী আছে?" সে বলে।

"তা বটে। দূরের মাঠ যেমন আরো সবুজ, পরের বন তেমনি আরো মধুর।" বনানীর গভীরতায় আমার প্রবেশ।

"তুমি কি মেঘেনবাবুর সেই রকমের বোন নাকি ?"

"পরস্মৈপদী বোন বলছ ? না, তা নয়। সেরকম বোন খুব বেশিদিন পর থাকে না—বোন ধুয়ে গিয়ে ক্রমেই বন্ধু হয়ে পড়ে—শেষে, উপসংহারে, fool-শয্যায় ফেলে পরাস্ত করে ছায়। না, আমি কারো তেমন বোন নই—এবং হতেও চাইনে। তবে আমি মেঘেনবাবুর ঠিক মায়ের পেটের বোন না হলেও তাঁকে আমার সহোদর বল্‌তে বাধা নেই। অভিন্ন হৃদয় বলে' একটা কথা শুনেচ তো ? তেমনি আমরা অভিন্ন-উদর।"

"হয়েছে হয়েছে। এখন দয়া করে' একটু মেঘেনবাবুকে ডেকে দেবে—বলবে যে, রণু ডাকছে ?" তারের এপারে থেকেও যেন ওর স্বস্তির নিঃশ্বাস শুনতে পাই। এতক্ষণ পরে।

"সেকথা বল্লেই হয়! ফুরিয়ে যায়। তা না, কী বোন, কার বোন, কেন বোন—এই সব বোনের কান্না—এত অরণ্যে-রোদন কেনরে বাপু ?" এই বলে' আমি নব মেঘদূত হয়ে মেঘেনবাবুর অন্বেষণে বেরুই—এক CALL-পান্ত পরে।

মেঘেনবাবুর কিন্তু এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না—খবর দিতে না দিতেই তিনি হাজির। রণু-কূলের প্রতি তিনি যে স্বভাবতই অনুকূল সেটা বেশ বোঝা যায়।—"হ্যালো !"

"আমি রণু। রূপমহলে ফোন করেছিলাম। ম্যাটিনি শোর দুটো পাশাপাশি সীট কিন্তু পাওয়া গেল না।—"

"তা রবিবার না হয়, অন্য দিন হবে। রাত্তিরের শোয় গেলেই বা ক্ষতি কি?"

"না। রাত্তিরে হয় না। তাছাড়া, আর হবেই না। কোনদিনই হবে না বোধহয়। সুনীতি চাটুজ্যের কী একটা সভা ভারী গোল বাধিয়েছে।...পাশাপাশি সীট্ ফর্ এভার্ দুর্লভ। তাই অন্য কোনো থিয়েটারেও আর খোঁজ নিইনি। তা হলে কি হবে বলুন তো?"

"সিটি বুকিং-এ খুঁজেছিলে?"

"কোথায়? কোথায় বল্লেন?"

"রেলোয়ে বুকিং অফিসে? বোম্বে মেল, ম্যাড্রাস্ মেল—তুফান মেল ইত্যাদিতে হয়ত পাশাপাশি সীট পাওয়া যেত।"

"মেঘেন বাবু, আপনি—আপনি কি—?" রণু যে আকাশ থেকে পড়েছে তার অণু-রণণ থেকেই বুঝি। স্পষ্টই বোঝা যায়।—"কী বলছ তুমি? সত্যি বলছ? মেঘেন, আমরা কি—ইলোপ করব আমরা?"

'আপনি' থেকে এক ঝট্‌কায় সম্পর্কটা আপনা-আপনির মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

"ইলোপ হয়ত বলা যায়, কিন্তু বিলোপ নয়। মানে

কিনা—কি বলে গিয়ে—এই ইয়ে অবধি আমরা এগুব—কিন্তু বিয়ে নয়।”

“তায় মানে ?”

“অচিন্ত্যর ‘বিবাহের চেয়ে বড়ো’ পড়েচ নিশ্চয়—সেইরকম অচিন্ত্যনীয় কিছু একটা করলে কেমন হয় ?”

“আচ্ছা—সে তখন দেখা যাবে। গাড়ীতে একবার চাপা যাক্ তো—তখনকার কথা! আচ্ছা, তাহলে তাই ঠিক রইলো। একটু দাঁড়াও—টাইম টেবলটা দেখে বলে দিই।··· রবিবার হাওড়া ষ্টেশনে সন্ধ্যে সাতটায় পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যে গাড়ী ছাড়বে তার প্রথম ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরায় আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতে পারব না। যদি চেনা লোকের চোখে পড়ি ? তুমি সটান্ একেবারে কামরায় ঢুকে পোড়ো। কেমন ? দুটো টিকিট কেটে রাখব—সুদূর কোনো ষ্টেশনের! গাড়ীটা হচ্ছে ম্যাড্রাস্ মেল্—সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাওয়া যায়। সে যাক্, কোথায় যাচ্ছি তা গাড়ীতে উঠে জানতে পাবে। তুমি উঠবে গাড়ীর গোড়ার থেকে প্রথম ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা যেটা সেইটেয়, মনে থাকবে তো ?”

“ফার্স্ট ক্লাস্ ফার্স্ট—এই তো ? এ আর মনে থাকবে না ? বেশ, আমিও তাহলে গাড়ী ছাড়বার ঠিক আধ সেকেণ্ড আগে উঠবো···”

“বলি হ্যাঁগা, কার সঙ্গে এত কথা কইছো?” কল্পনা পাশে এসে দাঁড়ায়।—“কী এত কথা বাপু তখন থেকে?”

"এই—এই একটু বাক্যালাপ করছিলাম।" রিসিভার রেখে দিয়ে বলি।

"কার সঙ্গে এত কথা গো ?" ও জিগেস করে।

"যার তার সঙ্গে—কিছু ঠিকঠিকানা আছে ? আর একজন কী! সকাল থেকে খালি রং নম্বরে ছিলাম। নিখরচায় একটু মজা করে নেওয়া গেল।"

"ও !" কল্পনা একটু মুখটিপে হাসে মাত্র।

কলকলধ্বনি থামার সাথেই আমার বুক গুড় গুড় করে। ট্রেনের চাকার আওয়াজ শুনি—বুকের ওপর দিয়ে লাইন চলে গেছে—আমারই বুকের ওপর দিয়ে। চলেছে সেতুবন্ধের দিকে—সেই mad-rush male ! ঘটাং ঘট্—ঘটাং ঘট্—ঘট্ ঘটাং—আসন্ন মেলনের—মেল্-দুর্ঘটনার ইঙ্গিত বয়ে ঘটা করে' চলেছে গাড়ীটা।

তার চাকার ঘট্রিকাব্য থেকে দেখতে দেখতে আরেক সুর বেরিয়ে আসে: "রেলের ভ্রমণ কি আপনার এতই জরুরি ? রেলের ভ্রমণ কি আপনার এতই জরুরি ? রেলের ভ্রমণ কি...... ?" এবম্প্রকার শুনতে থাকি। যুদ্ধ-বার্তাবহ সামরিক বিজ্ঞাপন, চাকায় ভাষান্তরিত হয়ে, আমার অন্তরে সাড়া জাগায়।

না, এমন কিছু জরুরী নয়, জরু-র এমন কোনো প্রয়োজন

আমার নেই। কল্পনাই রয়েছে! ইহকালের কটাদিন কল্পনার দ্বারাই কাটানো যায়। অন্য দারার প্রয়োজন কী? কিন্তু আকর্ষণমাত্রই অদৃশ্য। আর তার ফলাফলও অদৃষ্ট ছাড়া কী? রবিবার যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে এগিয়ে এল, সান্ধ্য সাতটাও তেমনি অনিবার্য হতে লাগল। সাত পাঁচ ভাবনা ছেড়ে, সাতটার সন্ধিক্ষণে এবং প্ল্যাটফর্মের পাঁচ নম্বরে—প্রথম শ্রেণীর প্রথম কামরায়—গাড়ী ছাড়ার সিকি সেকেণ্ড পরে—চলন্ত গাড়ীতেই—বিচলিত হয়ে সে কে? কে আর? এই মক্কেল।

কামরার মধ্যে আমার অদৃষ্টের কামড় অপেক্ষা করছে, ভালোই জানতাম। তবু, দুষ্ট আ-গ্রহে যাকে টেনেছে তার বাঁচোয়া কই? পদস্খলন বাঁচিয়ে (ঐ পথেই হাসপাতাল হয়ে একটা নিষ্কৃতি ছিল) চল্‌তি গাড়ীতেই আমি চল্‌কে উঠেছি।

চল্‌কে উঠেই ফের আরেক চলক্‌! আরেক চলচ্চিত্র!

"রণু?" আমার অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বিশ ফুট বিস্ময়।

"সে-পেত্নীকে আমি আগেই ভাগিয়েছি—এখানে এসেই। রণুকে আর পেতে হচ্ছে না।"

রণু নয়, কল্পনা।

কে জানতো, সেদিনকার টেলিফোন-লীলার কালে অনেক আগে থেকেই ইনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হায়, 'সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি!'

সজাগ হলাম এখন—রণুমূর্তির স্থলে রণমূর্তি দেখে :
সেদিন রিসিভার নিয়ে call-পণা করার সময়ে, যা ভুলেও
কল্পনা করিনি—সেই কল্পনাতীতার অকূলে এসে।

কোন্ রণনীতি এখন, কে জানে !
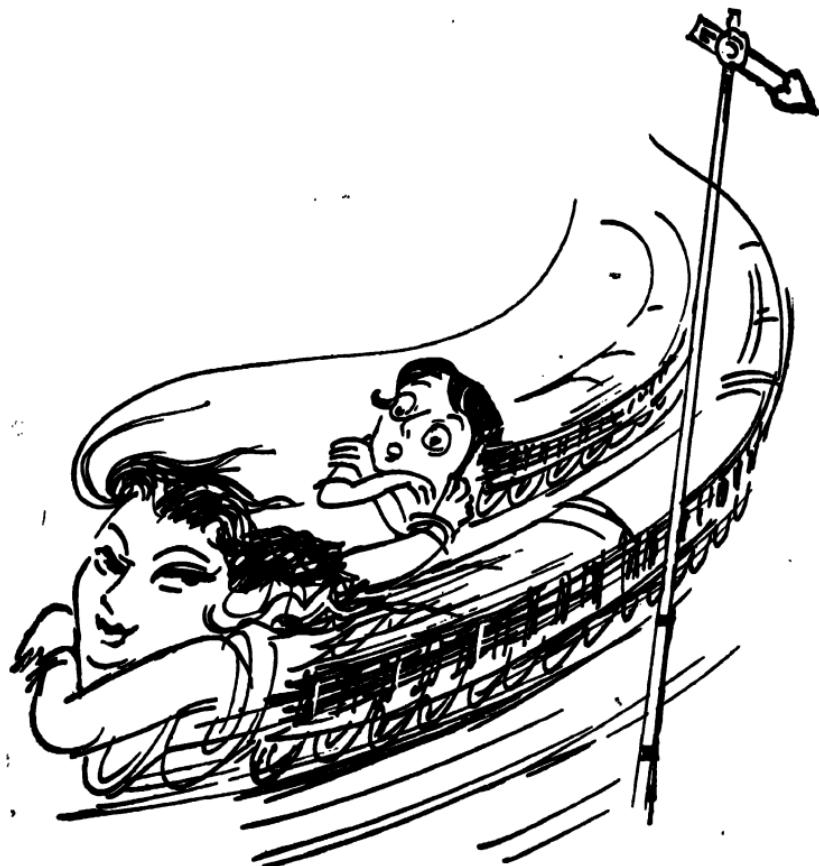
তৃতীয় পর্ব

MONEY-ক্য

“যতীনের সালুন্ থেকে দাড়ি কামিয়ে আসি, কি বলো?” আমি কল্পনার অনুজ্ঞার অপেক্ষা রাখি।

অর্দ্ধাঙ্গিনীর অনুমতি ছাড়া এক পা নড়তে চড়তে পারে কিম্বা নাড়তে চাড়তে সাহস পায়, এমন মতিচ্ছন্ন অর্দ্ধাঙ্গ যে ভূভারতে কোথাও আছে তা আমার কল্পনার বাইরে। আর থাকলেও আমি তার বাইরে তো বটিই।

কল্পনা আমার প্রতি রোষকষায়িত ভ্রূক্ষেপ হানে।

“তুমি কি ভেবেচ যে আমি তোমার দাড়ি কামানোয় বাধা দেব?” বলে সে ঃ—“যে অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েচো? দাড়ি গোঁফের বনজঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বামী আমি আদপে পছন্দ করিনে। কিন্তু আমার কথা হচ্চে, নিজে নিজে কামাতে কী হয়েচে? কেন, মেঘেনবাবু তো নিজে নিজে বেশ কামান্! তুমি কেন পারো না?”

“কেবল দাড়ি কেন, মেঘেনবাবু তো টাকাও বেশ কামান্!” আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি ঃ “তাই বা আমি পারি কই?”

"মালক্ষ্মীকে দাঁড়াতে দিচ্ছ কি? তোমার দাড়িতেই তো রোজ দুআনা করে' বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে গেলে—" কল্পনা হিসেব করে বলে: "বছরে পঁয়তাল্লিশ টাকা বার আনা ওই পথেই তো ফুঁকে যায়। দশ বছরে তাহলে কতো টাকা যায় ভেবে দেখেচ?"

ভেবে দেখার চেষ্টা করি, কূল পাই না। কল্পনার ইকনমিক্স্ ছিল কলেজে, আমার তো আর তা ছিল না; সত্যি বল্‌তে আমার কলেজই ছিল না। মানসাঙ্কে আমি থই পাবো কি করে'? ওর প্রশ্নপত্র আমি অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করি: "কত যায় তুমিই জানো!"

"চারশো ছাপ্পান্ন টাকা চার আনা।" কল্পনার যেন মুখস্ত জবাব: "কম টাকা কি?"

টাকার পরিমাণ কল্পনা করে' আমার চোখ বড়ো হয়ে উঠ্‌ল। সত্যি, বড়ো কম টাকা নয়! এবং অন্ততঃ দশ বছর ধরে যে দাড়ি কামাচ্ছি সেকথাও তো মিথ্যে না—বরং দশ বছরের ঢের বেশি হওয়াই সম্ভব। কিন্তু কী আশ্চর্য, টাকা জমিয়ে না রেখে, এইভাবে তিলে তিলে কমিয়ে ফেল্‌লে, কিম্বা কামিয়ে ফেলে দিলে, কিচ্ছু টের পাওয়া যায় না।

"বল্‌ছো ঠিক, কিন্তু কি জানো? বাড়ীতে কামাতে হলেই আমার যেন দাড়ি কেমন করে! ব্লেড্ কেনো নিত্যি—তারপর সাবান বুরুশ্—কতো হাঙ্গাম্। তারপর নিজে

কামাতে গেলেই আমি দেখেচি নিজেকে কেটে কুটে ফেলি। মেজাজ বিগড়ে যায়, আত্মগ্লানি জাগে। নিজের পৌরুষে ধিক্কার লাগে—সারা দিনটা খারাপ যায় আমার। তার তুলনায়

সালুনে গিয়ে কামানো তো স্বর্গ। সেই যে কোন্ মুঘল সম্রাট বলেছিলেন না যে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এইখানে—এইখানেই। তা বোধহয় এই সালুন্ সম্পর্কেই।"

কল্পনা অঙ্কে পাকা কিন্তু ইতিহাসে কাঁচা—ঠিক ইক্‌নমিক্‌সের উল্‌টো—তেমনি আমি আবার তাতে পরিপক্ক। ঐতিহাসিক নজির মেনে নিলেও, আমার ওজোরে সে সায় দিতে পারে না। "—কিন্তু তুমি তো আর মুঘল সম্রাট নও—" বল্‌বার চেষ্টা করে।

আমি রবীন্দ্রনাথ কপ্‌চে, 'তুমি মোরে করেচ সম্রাট্‌' উদ্ধৃত করে' ওকে দমিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তখন আমি সালুনের স্বর্গসুখ-কল্পনায় বিভোর।

"আরাম করে' চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকো! আহা, যখন স্প্রে করে' গোলাপ জল ছিটিয়ে দেয়! তারপর কামানো শেষ হয়ে গেলে যখন নরম-গরম তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে—আমার তো ঘুম পেতে থাকে। তারপরে, কামানোর পরে, হেয়ার্‌-ড্রেসিং—"

কল্পনা আঁৎকে ওঠে।

"য়্যাঁ? তারপরে হেয়ার্‌ ড্রেসিং—হেয়ার্‌-ড্রেসিংও?" তারস্বরে ও বলে' যায়ঃ "তার মানে তার ওপরে আরো এক আনা—অর্থাৎ, বছরে বাইশ টাকা আট আনা আরো? দশ বছরে উপরন্তু আরো দুশো আটাশ টাকা দু'আনা—?"

"এক আনা? তার মানে?" আমি প্রতিবাদ করিঃ "এক আনায় হেয়ার ড্রেসিং হয়? চুল কি আমার ফ্যালনা?

দাড়ির তুলনায় তুচ্ছ নাকি? আমার মাথাকে গাল দিতে পারো কিন্তু গালের চেয়ে তার দাম বেশি।"

বিস্ময়ের তাড়নায় কল্পনার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে: "তোমার সামান্য ওই মুখ আর মাথা পরিষ্কার রাখতে রোজ য়্যাতো খরচ? গোটা ইডেন্ গার্ডেন্ দুরস্ত রাখতেও তার মালীতে যে য়্যাতো নেয় না গো!"

শুনে আমিও চম্‌কাই। আমি তো অবুঝ নই! কেউ কোনো জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখতে পাবো না যে তা নয়; অন্ততঃ আঙুলটাকে তো দেখ্‌ব। যারপরনাই বাজে একখানা মুখশ্রী বজায় রাখতে বছরের বাজেটে পঁয়তাল্লিশ—উহুঁ, পঁয়তাল্লিশ দুগুণে কত হয় তত টাকা অপব্যয়—আমারও খুব বিশ্রী লাগে। এই টাকাটা আমি কত না জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে পারি। যাদবপুরে দেয়া যায়। এমন কি, অগ্রিম প্রতিবিধানকল্পে, পাড়ার পনেরটা ভাবী যক্ষ্মারুগীকে এক বোতল করে' পুষ্টিকর টনিক ঐ টাকায় খাওয়ানো চলে এবং তাতেও কতো কাজ হয়। নেহাৎপক্ষে, আর কিছু না হোক্ ঐ টাকায় মাসকাবারে একদিনও অন্ততঃ কোনো সাহেবি হোটেলে গিয়ে খানা খেয়ে আসা যায়—আমি নিজেই খেয়ে আসতে পারি। জনসেবার দিক দিয়ে সেটাই বা এমন কম কি? আমিও তো জনতারই একজন। জীবে দয়ার গোড়ায় তো প্রথমেই নিজের জিভ। নিজের অগ্রভাগ।

সেইদিনই খাবার সময়ে কল্পনাকে বল্লাম: "চন্দ্রবদনের চাকচিক্য দেখেই বুঝতে পারছ যে পাড়ার সালুনে গেছলাম। তবে আজিই খতম্! আজকেই কাটান্-ছেড়ান্ করে' এসেছি। যতীনের হাতে পয়সা চার আনা গুঁজে দেবার সময় চেপে ধরে' বল্লাম—"

"পয়সাটা?" কল্পনা জিজ্ঞেস করে।

"না, যতীনের হাত। যতীনের হাতটা হস্তগত করে' বল্লাম, হে বন্ধু, বিদায়! চির-বিদায়! এই আমার এখানে শেষ দাড়ি কামানো।"

"কী বল্লে যতীন?" কল্পনা জানতে উদ্গ্রীব।

"কাঁদ্তে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বুঝি? আমি বল্লাম, না, পাড়া থেকে যাচ্ছিনে, তবে এখন থেকে দাড়ি রেখে যাব। তোমায় আর আমার মুখদর্শন করতে হবে না—করলেও দাড়ির আড়ালে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।"

কল্পনা পুলকিত হয়ে ওঠে: "সত্যিই যদি তোমার এমন সুমতি হয়ে থাকে, যথার্থই যদি আমার উপদেশ মেনে যতীনের নর্দমা দিয়ে বছরে একানব্বই টাকা চারআনা না গোল্লায় পাঠাতে চাও তাহলে তো তুমি মানুষ হয়ে গেলে। তোমার জন্যে আমি খুব সস্তা স্বদেশী ব্লেড কিনে আন্‌ব—আর, যদিও যুদ্ধের বাজারে একখানা ব্লেডের দামই এখন অনেক—তাহলেও কাঁচের

গেলাসের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্লেড্ শানানোর একটা কৌশল আছে—তার সাহায্যে পুনঃ পুনঃ ধারালো করে' নিয়ে একটা ব্লেডেই এক শতাব্দী কামানো যায়—আমার এক মেয়ে-বন্ধু বলেছিল আমাকে।"

"সেই মেয়েটি বুঝি সেইভাবে দাড়ি কামান? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে?" আমি অবাক্ হয়ে যাই। মেয়েদের নৈপুণ্যে চিরদিনই আমি কাতর—কিন্তু এই বিস্ময়কর সংবাদ যেন আমাকে পাথর করে' দেয়।

"মেয়েটি কেন, তার বর। আদিখ্যেতা হচ্ছে?" কল্পনা নিজেই শাণিত হয়ে ওঠে।

"না, আদিখ্যেতা নয়, এই আদি।" আমি বলি: "এর পর থেকে দাড়িই রাখব আমি স্থির করলাম। আমাদের বোটুক্-খানায় তোমার দাদামশায়ের যে দাড়িওলা ছবি আছে অতঃপর তিনিই আমার আদর্শ। কেবল দাড়িতে নয়, সব বিষয়েই আমি তাঁর চেয়ে খাটো, চিরদিন তুমি এই খোঁটা দিয়েচ। দেখি অন্ততঃ একটা বিষয়েও তাঁর সমকক্ষ হতে পারি কি না!" আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করি।

লঙ্কার সোনা আর অলঙ্কারের সোনা এক জিনিস নয়; যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ; দাদামশায় হলে দাড়ির বন হতে বাধ্য, দাড়ি ছাড়া দাদামশায় মনোরম নয় নিশ্চয়—কিন্তু স্বামীর

অঙ্গে উক্ত অলঙ্কার ঠিক মানায় কি না—স্বামী বনতে হলে স্বামীর বন তেমন জরুরী কিনা এবিষয়ে কল্পনার মনের কোথাও যেন খট্‌কা ছিল। নিয়ত-বর্দ্ধমান দাড়ি, ক্রমশঃ স্বর্গীয় হয়ে (সামান্য একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ হতে কতক্ষণ? দাড়িমাত্রই তো ঋষিত্বের আম্‌দানিকারক অপার্থিব ব্যাপার!) শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য-জীবনের মাঝখানে দাঁড়ি হয়ে না দাঁড়ায়, এরকম আশঙ্কার কারণ ছিল বোধহয়। দাড়ি জিনিসটাকে যে স্বামীর প্রয়োজনীয় প্রত্যঙ্গরূপে সে জ্ঞান করে না, সেটা পরে প্রকাশ পেল নৈশ বক্তৃতার আসরে।

হাতপাখার হাওয়ার সাথে ওর কথাগুলো আধঘুমন্ত কানের কাছে উড়ে আসতে লাগল ঃ

"আমার এখন কি মনে হচ্চে জানো? যতীনের সালুনে দাড়ি কামানোটা ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। ওতে যে সত্যি আমাদের সাশ্রয় হবে তা নাও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হয়ত আমরা—আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো! বুঝেচ?"

আমি বলি ঃ "হুঁ।" ওর কথায় আমি কখনোই দ্বিরুক্তি করিনে, ঘুম এলে তো কথাই নেই! কল্পনার বোঝাই যথেষ্ট, ওতেই আমি হালকা বোধ করি, ওর বেশি বুঝতে চাইনে।

তার কারণ, আস্ত কল্পনার বোঝাটাই তো আমার—তার ওপরে আবার শাকের আঁটির বাহুল্য বাড়িয়ে লাভ?

"হুঁ নয়, ইকনমিক্সেও এই কথাই বলে।" কল্পনা আমাকে বোঝাবার—আমাকেও বোঝাই করার চেষ্টা করে : "মনে করো তোমার কাছ থেকে ওর যে দৈনিক চার আনা উপায় ছিল সেটা যদি ওর চলে যায়—মাসিক ওর সাড়ে সাত টাকা কমে গেল। আয়ের ঘরে এই অঙ্গহানি হলে ওর সালুনে সকলের পড়বার জন্য যেসব দৈনিক মাসিক পত্র ও রাখত, সে সবের চাঁদা দেয়া ওর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। ফলে ঐ ঐ কাগজের কাটতিও কমল। চারদিক থেকে এইভাবে কাগজ-ওয়ালাদের আয় কমতে থাকলে তারাই বা তোমার লেখা নিতে যাবে কেন? অন্ততঃ আগের মত উচ্চমূল্যে নিতে রাজি হবে না। প্রথমে ভেবেছিলাম বটে যে, বছরে প্রায় একানব্বই টাকা বাঁচলে আরো খান্ কয়েক করে নতুন শাড়ি কেনা যায়—টাকাটার সদ্ব্যবহার হয়—কিন্তু না, এখন ভেবে দেখ্‌চি, তোমার দাড়ি রাখা ঘোরতর অবৈধ হবে।"

"হুঁ।" আমি একবাক্যে সায় দিই। নৈশ আলাপে ঐ একমাত্র অব্যয় শব্দই আমার সর্বস্ব।

তারপর থেকে আমি নিয়মিতভাবে যতীনের সালুনে যাতায়াত করছি। জাতীয় অর্থচক্র যাতে অবাধে অব্যাহত চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমার এই প্রাত্যহিক

তীর্থযাত্রা। সকালের ক্ষৌরির সাথে সকলের উপায়ের পথ ওতোপ্রোতো। আর সে পথ পরিষ্কার রাখাই অর্থনীতির গোড়ার কথা। অনর্থ এড়ানোরও ঐ রাস্তা। আর তাই হচ্চে জনসেবকের এক নম্বর কাজ। নিজেকে চালু রাখাই অবশ্যি তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কিন্তু দাড়ি রাখলে তার বিহিত হয় না।
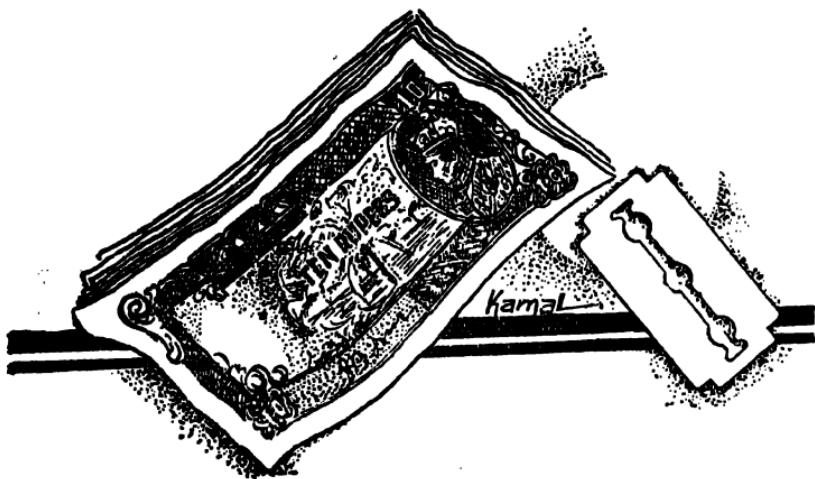
চতুর্থ পর্ব
মুখ্য

"সিগ্রেট খাওয়াটা এইবার ছাড়ো দিকি !" বল্ল কল্পনা।

"সিগ্রেট ছেড়ে—ছেড়ে দিয়ে—কী নিয়ে থাক্‌ব ?" এক মুখ ধোঁয়া আর দীর্ঘনিশ্বাস এক সাথে ছেড়ে দিই।

কল্পনা আমার সিগ্রেটের ঘোর বিপক্ষে। ওর মতে টাকাগুলো এভাবে ধূম্রাকারে না উড়িয়ে, ধোঁয়ায় না ফুঁকে দিয়ে জমিয়ে রাখলে কাজ ছ্যায় ! কেন, দশজনকে ডেকে এনে দেখাবার মতো, কত কীই তো কেনা যেতে পারে সেই টাকায় —এই যেমন শাড়িটাড়ী—কিন্‌লে কেনা যায় নাকি ? মানে, কথা এই, ধূমপানের বদলে ধূমধামের ও পক্ষপাতী। মেয়েরা যা হয়ে থাকে সাধরণতঃ। অর্থাৎ, অসাধারণ মেয়েরাই যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—সেই কথাই আমি বল্‌ছি !

কল্পনাকে আমি সাধারণ মেয়ে বলে তো ভাবতে পারি নে।

"দিনরাত সিগ্রেট মুখে করে থাকতে তোমার ভালো লাগে য়্যাতো ?"

কল্পনার মুখে সিগ্রেটের সম্মুখের চেয়ে বেশি ঝাঁজ !

আর শানাবে ? অতো ভাসা ভাসা জিনিসে ? ভাষার চেয়েও ভারাত্মক এবং ভাবাত্মক, সিগ্রেটের ব্যতিক্রমে (যে উপাদেয়তর বস্তু পেলে সিগ্রেট টান্‌বার প্রয়োজন তখকার মতো অন্ততঃ অনুভূত হয়না !) মুখের সেই অপব্যবহারই করতে হবে নাকি শেষটায় ?

"...আমি—আমি—আমার মতো..." কল্পনার ভেতর থেকে রীতিমত ধোঁয়া বেরয় ! আমার সিগ্রেটের চেয়েও বেশি বেশি !

আমি এগিয়ে যাই । *সিগ্রেট টানার* ফলেই, বোধ করি, এমনি একটা দুর্বলতা আমার দাঁড়িয়ে গেছে যে, প্রধূমিত কোনো কিছুর সাম্‌নে আমার পক্ষে আত্মসম্বরণ করে' থাকা কঠিন । ধোঁয়া বেরুতে দেখলেই না টেনে পারিনে—

এবং টানতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি চপেটাঘাত লাভ করি !

"তখুনই তো বল্লাম ? বল্লাম না যে, তোমার সঙ্গে মৌখিক সম্বন্ধ আর নেই আমার ! একেবারে আন্ত্রিক ! দেখলে তো !" আহত গালে হাত বুলোতে বুলোতে দৃষ্টান্ত দিই ।

"এবং তুমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে—কোনো মেয়ের সঙ্গে এ ধরণের মৌখিকতা কি তুমি পছন্দ করবে ? অবশ্যি, সিগ্রেটের বদলে চুমু খেতে পেলে, আমি চালিয়ে নিতে পারি । সিগ্রেটের মতই, পরস্মৈপদী আর এনৃতার যদি মেলে, কষ্টেসৃষ্টে কোনোগতিকে হয়তো চালানো যায়, কিন্তু অন্য কোনো এক বা অনেক মেয়ের সঙ্গে মৌখিক ব্যবহার,—

আমি হলফ্ করে' বল্‌তে পারি তার মধ্যে একবিন্দুও আন্তরিকতা থাক্‌বে না—কিন্তু তাহলেও—সেটা কি তুমি পছন্দসই মনে করবে?"

"···আমি···আমি আর এখানে···আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও···"

কল্পনার ধোঁয়া বাষ্পান্তরিত হয়ে মেঘলা মুখের আকাশ ছেয়ে বর্ষণে পরিণত হবার উপক্রম!

এবং এরপর অচিরেই, বলা বাহুল্য, আমাকে সিগ্রেট খাওয়া বর্জন করতে হোলো। সিগ্রেট আর এ-জীবনে ছোঁব না, এই প্রতিজ্ঞা করতে হোলো সেই দণ্ডেই!

এবং এই করে'—একবার নয়—এইবার নিয়ে পাঁচ পাঁচবার আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা হোলো। প্রতিজ্ঞা হচ্ছে পৌরুষের একটা লক্ষণ। কে না জানে! এবং লক্ষণমাত্রই বর্জনীয়,—ত্রেতাযুগ থেকে তার উদাহরণ রয়েছে। চুমু যেমন নেবার জন্যেই দেয়া হয়ে থাকে, প্রতিজ্ঞাও তেমনি ভাঙবার জন্যেই বানানো। দুটো কাজই প্রায়—করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে নাকি বল্‌তে গেলে?

বার বার—তিনবার নয়—পাঁচ পাঁচ বার পৌরুষের পরাকাষ্ঠা করার পরে, বেশ বুঝতে পারি, এবার কেবলমাত্র আরেক নম্বর প্রতিজ্ঞার পরিত্যাগে কল্পনাকে ঠাণ্ডা করা যাবে না—তার চেয়ে আরো বেশি ত্যাগস্বীকার করা চাই। ওকে

এবার চমৎকার একখানা শাড়ি, মায় ব্লাউজ পিস্, না কিনে দিলেই নয় দেখ্‌ছি!

তারই উপলক্ষ্য খোঁজবার ছলে জিগ্যেস করি: "তোমার জন্মতিথিটা কবে এবার?"

মেয়েদের বোধহয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে। আমার সন্ধি করার অভিসন্ধিটাও বুঝ্‌তে পারে তৎক্ষণাৎ। অশ্রুসম্বরণ করে' বলে: "আমাদের বিয়ের তিথিটা কবে জান্‌তে চাচ্ছ?"

"আহা, সেটাতো আমার মৃত্যুর তারিখ? আমার দেহ-রক্ষার দিন! আমার তিরোধানের দিবস!—সেটা কেন? তোমার জন্মতিথিটা কবে জান্‌তে চেয়েছি।"

"আজকেই আমার জন্মদিন!—" কল্পনার মুখের মেঘলা কেটে গিয়ে সূর্যালোকের উপক্রমণিকা দেখা দিয়েছে ফের: "যদি দিতে চাও তাহলে আমাকে বাঁদামী রঙের সেই শাড়িখানা দিয়ো। সেই যেটা জহরলালের দোকানে সেদিন দেখে এসেছিলুম! একটু দামী হবে—তা হোক্!"

তা হোক্! তাতে কী? আমি আর বেশি কিছু বলিনে, তূষ্ণীভাবের আড়ালে মনের সম্মতি নাকি লুকোনা থাকে, এই রকম শুনেছিলাম, সেই তথাকথিত তথাস্তু বিনাবাক্যব্যয়ে বলে দিই—বিজ্ঞ জনের মত মৌনতার বিজ্ঞাপনের ভেতর দিয়ে কল্পনাকে জ্ঞাপন করি।

"সত্যি, তুমি ভারী লক্ষী ছেলে!" এই বলে কল্পনা দ্রুতপদে এগিয়ে এসে, তার সমালোচনাটা—আমার সম্বন্ধে তার নিজের এই মন্তব্য—আমার মুখপত্রে, সম্পাদকীয় স্তম্ভের মাথায় উদ্ধৃত করে—তাড়াহুড়ায় একেবারে আমার নাকের উপরেই মুদ্রিত করে' ছায়! স্টেট্স্‌ম্যানের বামারলড়ির সমাচারের মতই!

নাক মুছ্‌তে মুছ্‌তে আমি তাক্ থেকে টিন্ পাড়ি। আরেক টিন্ আন্‌কোরা সিগ্রেট!

"একি! আবার নতুন কৌটো খুল্‌ছ যে?" কল্পনা হাঁ করে তাকায়। "—এই প্রতিজ্ঞা করলে আর এখুনিই?"

"বাঃ, সিগ্রেট ছাড়বার প্রতিজ্ঞা তো আমার কেটে গেল—" আমি প্রতিবাদ করি: "কাটিয়ে নিলাম তো! শাড়ি কেনবার কথাই কি হোলো না শেষ পর্যন্ত? বাদামী রঙের সেই দামী—"

"না না, শাড়ি আমার চাইনে!—" সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার মত পালটে যায়: "বরং আমি দিব্যি গাল্‌ছি কোনোদিন আমি তোমার কাছে কোনো শাড়ীটাড়ির কথাও তুলব না, যদি তুমি কক্ষণো ওই ছাইয়ের সিগ্রেট মুখে আর না তোলো।"

"নতুন নতুন শাড়ি না হলে কি চল্‌বে তোমার?" আমার সন্দিগ্ধ প্রশ্ন। "কি করে' চালাবে তুমি তাহলে?"

"না চল্লে আর কী কর্‌ছি!" কল্পনা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে:

"তা না হলে তো তুমি তোমার সিগ্রেট খাওয়া ছাড়বে না। যা আমার ঐ খান্ ত্রিশেক আছে তাতেই কোনোরকমে চালিয়ে নিতে হবে। নিতেই হবে চালিয়ে—অদল-বদল করে' পর্‌তে হবে, কী আর করছি ?"

কল্পনার এই সদ্যজাত প্রস্তাবে এতক্ষণে আমার উৎসাহ হয়। যথেষ্ট প্রেরণা পাই—হ্যাঁ, একথাটা মন্দ নয় নেহাৎ! এরকম দোরোখা স্বার্থত্যাগ হলে মনের ভেতর আর খচ্ খচ্ করে না—প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যেও পর্যাপ্ত পরিমাণে মেলে। রোখ্ জাগে হায়, নিত্য নতুন রঙ আর ডিজাইনের শাড়ি ব্লাউজ কিন্‌তে কিন্‌তে তো ফতুর হতে চল্লাম, যেভাবে তীরবেগে চলেছি,—কোন্ তীরে জানিনে!—তাতে মনে হয়, দিনকতক বাদে নিজের জন্যে জামার ওরফে একটা ফতুয়াও কিন্‌তে পারব কিনা, কে জানে!

"বেশ, তুমি যদি নিত্য নতুন শাড়ি কেনা ছাড়ো, আমিও এই সিগ্রেট খাওয়া ছাড়লাম্!—" ধূমায়মান হাতের সিগ্রেটটাকে ভস্মসাৎ করে' ছাড়ব কি না, ভাবতে গিয়ে উৎসাহের আধিক্যে তক্ষুণি তক্ষুণি ছেড়ে দিই—ছুঁড়ে দিই ঘরের কোণে। ভেবে দেখি, ইতস্ততঃ করা কিছু না, গরম থাকতে থাকতেই লোহাকে—উঁহুহু—সোনাকে পিটিয়ে পাত করতে হয়—মেয়েদের সরগরম্ অবস্থাতেই অঙ্গীকৃত করে' ফেলা ভালো—নিপাত করার সেই সময়! কল্পনাকে অঙ্গীকার পাশে

বন্ধ করে ঐশ্বর্য-সঞ্চয়ের এহেন মাহেন্দ্রক্ষণ বিফল হতে দেয়া ঠিক নয়!

কল্পনাও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে, সদ্যোদ্ভিন্ন সিগ্রেটের কৌটোটাকে ছাড়পত্র দিয়ে জানালার বাইরে পার করে' দ্যায়। তক্ষুণি তক্ষুণি।

আমি হাঁ হাঁ করতে গিয়ে না না করে উঠি। তা না না না করে' থেমে যাই! কেননা খতিয়ে দেখ্‌লে এ ক্ষতি তো ক্ষতি নয়! যে মহাপ্রস্থানের পথে যাবার তাকে বাধা দেয়া কেন আবার! 'যেতে দাও গেল যারা।' এই বলে' নিজেকে প্রবোধ দান করি।

তারপর থেকে আমি প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা পালন করে' চলি— সিগ্রেটের মুখের দিকে দূরে থাক্, সিগ্রেটওয়ালার মুখের দিকে অব্দি চোখ তুলে চাই না। কল্পনাও নিজের জেদ্ বজায় রাখে; প্রায়-সেদিন-কেনা ত্রিশখানার সঙ্গে সাবেক কালের একশ' খানা এক করে'—মোটে তো একশ' ত্রিশখানা!—সেই ক'খানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে। কষ্টেসৃষ্টে ওই কটা পরেই চালায় কোনো গতিকে—কি করবে?

বেচারী!···ওর ওপর আমার সহানুভূতি হয়—আহা! সহানুভূতি আমার নিজের প্রতিও বড় কম হয় না—কিন্তু আমি, আমিই বা কি করব? প্রতিজ্ঞা কি অরক্ষণীয়া মেয়ের মতো সর্বপ্রকারে রক্ষণীয় নয়?

অবশেষে দিন পনের পরে, কল্পনার দিকের ম্যাজিনো লাইন্ ভাঙ-ভাঙ বলে' মনে হোলো। ওর দুর্বলতা প্রকাশ পেতে দেখলাম।

"ও-বাড়ীর বৌয়ের নতুন শাড়িখানা দেখেচ?" কল্পনা বলে: "আহা, কী চমৎকার!" ওর কণ্ঠস্বরে লালসা। "দেখেচ শাড়িটা?"

"কি করে' দেখব?" আমার আপত্তির সুর: "পরের বৌয়ের দিকে কি আমি তাকাই নাকি? পরস্ত্রীকাতর কবে তুমি আমায় দেখলে?"

"না না, আমি শাড়িটা দেখবার কথা বলছিলাম!" যেন ওর মতে বৌকে বাদ দিয়েও শাড়িখানা দেখা যায়!

"দেখে লাভ? আমি না সিগ্রেট খাওয়া ধর্‌লে তো তুমি আর ওরকম শাড়ি কেনার সুযোগ পাচ্ছ না?"

"তা বটে! আমিও শাড়ি না কিন্‌লে তুমিও আর সিগ্রেট মুখে তুল্‌তে পাচ্ছ কই!" কল্পনা দীর্ঘনিশ্বাসপাত করে। "তাই বটে!"

"কই আর পাচ্ছি!" আমার দীর্ঘনিশ্বাস চেপে যাই: "সেইরকমই তো আমাদের রফা হয়েছিল, নয় কি?"

রফা? না, দফা রফা? বলি মনে মনে।—সে যাই হোক্, তারপরে আরো দিন সাতেক যায়।

কল্পনা আর আমি কমলালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছি একদিন,

কল্পনা থম্‌কে দাঁড়াল আচম্‌কা : "ঐ শাড়িখানা দেখেচ। এমন ভালো লাগে আমার! যেমন রঙ তেম্‌নি ডিজাইন্! আমি এপথে গেলেই ওখানা একবার দেখে যাই,—ভ্যাখো না, কী চমৎকার!—"

দেখ্‌তে—দেখে চমৎকৃত হতে—বাধা কি আর? চেয়ে দেখি।

শাড়িখানা শোভনই বটে। পরলে কল্পনাকে মানাবে খাসা। সত্যি বল্‌তে, যাই ও পরুক্ না, আমি লক্ষ্য করে' দেখেচি, ওকে দিব্যি মানায়। ভালো শাড়ির চেয়ে ছেঁড়া কাপড়ে আরো! তবে সব চেয়ে যাতে ওকে মানায়—, নাঃ, থাক্!··· সে কথায় কাজ নেই······!

"দামও খুব বেশি না! দেখেচো?" শাড়ির গায়ে লট্‌কানো একটা চির্‌কুটের দিকে কল্পনা আঙুল চালিয়ে ছায় : "একশো তেত্রিশ টাকা এগারো আনা মাত্র!"

মাত্র! মাত্রই বটে! মাত্রাজ্ঞান আমার থাক্ আর না থাক্, আমার ন্যায় দুর্বল পুরুষের জীবনেও মাঝে মাঝে সবল মুহূর্তরা আসে। আকস্মিকভাবেই এসে যায়। আমি আর একটুও ওখানে দাঁড়াই না, কল্পনাকে হস্তগত করে' এক হ্যাঁচকায় শাড়িদের সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে চলে আসি।

বলি ওকে : "প্রাণবল্লভে! ঐ ভাবে শাড়ির দিকে কটাক্ষ

করে' আমার প্রাণে ব্যথা দিয়ো না। নিজের মনেও আর কষ্ট

পেয়ো না অমন করে'। ভেবে ছাখো, প্রতিজ্ঞা গেলে আর কী

থাকে মানুষের ? আর মেয়েরা মেয়ে বলে' কি মানুষ নয় ? প্রতিজ্ঞা যাওয়ার চেয়ে প্রাণ যাওয়াও ভালো—তাই নয় কি ? ভালো করে' ভেবে দ্যাখো। প্রতিজ্ঞা হারিয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে, বেঁচে থেকে কী লাভ ? শাড়ির কথা তুলে তুমি আর এভাবে আমাকে মর্মাহত কোরো না !—"

বক্তৃতার তোড়ে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে যাই—একেবারে চৌমাথার মোড়ে। মরে' যেতে যেতে বেঁচে যাই ! উঃ, কী ফাঁড়াটাই না কাটানো গেছে আজ। ইস্ !

এইভাবে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ (কিম্বা সন্ধিদ্বৈধ, যাই বলুন !) কতদিন চল্‌ত বলা যায় না, হঠাৎ মাঝখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল ! সেই দুর্ঘটনাটার এক ধাক্কাতেই ওলোট পালোট হয়ে গেল সব ! ইদানীং ময়দানে ব্ল্যাক্-আউট কিরকম জমেছে, জানবার জন্যে বেরিয়েছি একদিন—একলাই বেরিয়েছি। জমাট অন্ধকারে একাই যাওয়া উচিত এবং তার ভেতরে গিয়ে একাধিক হলেই যথেষ্ট,—আর একটিমাত্র অধিক,—ব্যস্ ! তার বেশি আরো লোক জমানো, ঐক্যের মধ্যে অনর্থক বিরোধ ডেকে আনা নয় কি ?

অন্ধকার যে এত জমাটি হবে তা কে জান্‌ত ! পায়চারির ফাঁকে—নাঃ, যা কামনা করে' বেরিয়েছিলাম তা নয়—(মনের সঙ্কল্পতরুর দেখা যায় প্রায় সবটাই নিস্ফল !) দৈবাৎ অকস্মাৎ —এক গাছের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধে গেল !

পাশ দিয়ে এক অদৃশ্য মূর্তি যাচ্ছিলেন, ধরাশায়ী আমাকে তিনিই তুলে ধর্‌লেন।

"এই অন্ধকারে এমন গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌ছেন কেন? কিছু টেনেছেন নাকি?"

"কার সঙ্গে আর করি ?" আহত আগাপাশতলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে হয় ঃ "গাছ ছাড়া আলিঙ্গন করতে এই গেছো বরাতে আর পাচ্ছি কী বলুন্ !"

"যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে! যেতে দিন্! আপনার এই ধাক্কাটা আমার ওপর দিয়েও তো যেতে পারত। বেঁচে গেছি খুব! গাছের ওপর দিয়েই গেছে সেই রক্ষে! ভগবান যা করেন ভালোর জন্মেই—নিন্, একটা সিগ্রেট খান্ !"

সকৃতজ্ঞচিত্তে আমি সিগ্রেটটা নিই। সধন্যবাদে। ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেদনা দূরে যায়। স্বর্গের ধারণা নেমে আসে ধরণীতে আর আমার হাতে—আমার এই দুই আঙ্গুলের আলিঙ্গনের মাঝে। চিরদিনের রহস্য অচির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে—ক্ষণিকের সিগ্রেট যেন চিরদিনের আলোক বিকীরণ করে। অল্পক্ষণের ঘনিষ্ঠতার অবকাশ ঘনীভূত বিলাসে এই জীবনের সমস্ত যাদুকে লীলায়িত করে' তোলে যেন! অনন্তকাল যেন মূর্ত হয়, মুহূর্ত হয়।

"ব্ল্যাক্ আউটের রাত্রে সিগ্রেট মুখে রাখা ভালো!" সহানুভূতিপরবশ ভদ্রলোক সদয় হয়ে উপদেশ গ্যান্ ঃ "কোন্ দিকে চলেছেন, সাম্‌নে কি, পেছনে কে, তার খানিকটা হদিশ পাওয়া যায় তাহলে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যা বলেছেন!" একটানে সিগ্রেটটাকে আধখানা করে' আনি—

"যা বলেছেন মশাই। এরপর থেকে—" বল্‌তে বল্‌তে মনে পড়ে যায় আমার। অবচেতনা থেকে পূর্ণ চেতনায় ভেসে উঠি সেই দুঃসংবাদ। দুঃসহ সংবাদ!

এতদিন পরে, সিগ্রেটের ওপর এতখানি টানের কারণও তখন টের পাই।

"সর্বনাশ হয়েছে!—" আমি চীৎকার করে' উঠি: "এবার শাড়ি না দিয়ে আর যাই কোথায়? মাটি করেছে!—"

বল্‌তে বল্‌তে সেই অন্ধকারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে, গাছ পাথরের থোরাই কেয়ার করে আমি ছুট্‌তে থাকি। সিগ্রেট ফেলে দিয়েই দৌড় মারি!

দাঁড়াই এসে একেবারে কমলালয়ের সাম্‌নে।

একশো তেত্রিশ টাকা সাড়ে এগারো আনার শাড়িটা বগলদাবাই করে' অনুতাপে তেতে পুড়ে বাড়ি ফিরে ব্রীড়াবনত মুখে প্রিয়তমার কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

আড়াল-করা আলোর আবডালে দাঁড়িয়ে, আমার ছড়ে-যাওয়া আহত হাত পা'র সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহ আজকের ব্ল্যাক-আউটের বিস্তৃত বৃত্তান্ত দিয়ে ভূমিকার পরে কুণ্ঠিত্-ভাবে আমার কমলালয়ের পরাজয়ের কাহিনী বল্‌তে শুরু করেছি—

এমন সময়ে আমার নজরে পড়ল—য়্যাঁ? চম্‌কে উঠে আমি ভালো করে' ফের আমার দু' চোখ মুছে নিলাম। একি!

আমার টেবিলের ওপরে আনকোরা এক কৌটো সিগ্রেট কেন? সিগ্রেটই তো!

"একি? এর মানে?" আমার সন্দেহজড়িত স্বর।

"আমার কি চোখ নেই? আমি কি দেখছি না যে,

সিগ্রেট্ না খেয়ে তুমি দিনদিন কিরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ! কিরকম যেন ম্লান বিবর্ণ মনমরা হয়ে যাচ্ছ দিনকের দিন!—"

"মোটেই না। মোট্টেই না!" আমি গলার জোরে প্রবল হয়ে উঠি।—"মোট্‌ট্রেই না! কে বল্লে?"

"সেই কারণে ভেবে দেখলাম, তোমাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করে' রাখা—এভাবে বেঁধে রেখে কষ্ট দেয়া—"

"কষ্ট কিসের! কে বলেছে কষ্ট?" আমি বাধা দিয়ে বলি।

আমার সংশয়াচ্ছন্ন আত্মার ভেতরে মারাত্মক এক আকুতি জিজ্ঞাসার চিহ্নরূপে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

"এমন কি কষ্ট!" আমি গদগদ কণ্ঠে বলে' যাই—"সিগ্রেট না খেয়ে আমি তো বেশ আছি—খাসাই! আমার স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়েছে বরং। আর আমার টি-বি হবার আশঙ্কা নেই। যাদবপুর আমার কাছে এখন সুদূরপরাহত—সেটা কি মন্দ? আমার কষ্ট হচ্ছে আমি কি বলেছি—বল্‌তে গেছি তোমায়?"

"বল্‌তে হয় না, তোমার মুখ দেখলেই আমি টের পাই—" বল্‌তে বল্‌তে কল্পনা দেরাজের খুপ্‌রি থেকে একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স বার করে: "এরপর এবার এই শাড়িখানা যদি আমি কিনে থাকি তাহলে তোমার খুব আপত্তি হবে না আশা করি?"

"এটা—এটা তো সেই তেত্রিশ টাকা সাড়ে এগারো আনারটা না তো ?" আমার কণ্ঠস্বরে কাঁপুনি !

"উঁহু। সে-ডিজাইনের একখানা পাশের বাড়ির বৌ-এর গায়ে দেখলাম কি না ! তারপর কি আর ওটা পরা যায় ? এটা আরেকটা। ওর চেয়ে ঢের—ঢের ভালো। দামও ওটার চাইতে একটু বেশি—খুব বেশি নয় তাবলে—এই আরো গোটা ত্রিশেক টাকা কয়েক আনা কেবল ! এমন আর বেশি কি ?"

পঞ্চম পর্ব

অখ্যাতি

উঃ, কী ভীড় ট্রামটায়! যেম্‌নি ভীড় তেম্‌নি অন্ধকার!

বাঁ হাতে আমার সেদিনের খবরকাগজের সান্ধ্য সংস্করণ, সম্ভকেনা শাড়ির মোড়ক আর এক বাক্স চকোলেট্‌ এবং ডান হাতে স্বয়ং আমি—মেয়েদের আসনের এক কোণ ঘেঁষে কোনোরকমে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেচি।

সাম্‌নে পেছনে চারধারে মুর্‌গী-বোঝাই মানুষ! ময়দানের খেলা-শেষের বাঁদুর-ঝোলাকেও হার মানিয়েছে!

বেঙ্গল-ষ্টোরে একটা অতি-প্রয়োজনীয় দাম্পত্যলীলা সেরে—শাড়ি কেনাটাকে দাম্পত্য উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ ছাড়া কী বল্‌ব? একমাত্র পরিচ্ছদও বলা যায়! পারিবারিক প্রেম ওর চেয়ে আর কিসে বেশি প্রকট হয়? যদ্দুর জানি, এক শুকদেব ছাড়া আর সবাইকেই শাড়ি কিন্‌তে বাধ্য হতে হয়েছে!—পাত্নী-ব্রত্যের প্রয়োজন সমাধা করে সবেমাত্র সন্ধ্যার মুখটায় ট্রামে ওঠা গেল, আর এর মধ্যেই চার ধার থেকে যেমন ভীড় তেম্‌নি কি অন্ধকার জমে আসে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিড়িকে, কলকাতা-রঙ্গমঞ্চে নিষ্প্রদীপ-অভিনয়ের প্রথম রজনী!

সেই প্রথম রাতটিকে অন্ধকারের রাজসংস্করণ বলা চলে—তারপরে নিষ্প্রদীপের যে সুলভ আট-আনা ছ-আনা সংস্করণ সন্ধ্যা হলেই দেখা যেত তার সঙ্গে সেই প্রথম নিরালোক রাত্রির তুলনাই হয় না। সে-রাতে আকাশে যেমন চাঁদ ছিল না, কোনো আড়ালে আব্ডালেও এক ফোঁটার আলো দেখা যায় নি।

সেই সুতানুটি-গোবিন্দপুর-আমলের পরে কলকাতার বুকে এমন জম্কালো অমানিশা দেখা যাবে কে কল্পনা করতে পেরেছিল? গাড়ি লাট সাহেবের বাড়ি পার হতে না হতেই অন্ধকার ভারী হয়ে এসেছে—চারধার একেবারে ঘুট্ঘুট্টি! কোনো ফাঁকে-ফোকরেও এক আধ টুক্রো আলোর উঁকি-ঝুঁকি নেই!

আজ টিকিট্ কাটার বালাই ছিল না বলে ভীড়ও কি তেম্নি? জম্জমে অন্ধকার সারা শহরে কেমন জমেচে জানবার বাসনা জাগা স্বাভাবিক। আর সমারোহ করে দেখতে গেলে ট্রামে আরোহণ করে ঘোরাই শ্রেয়ঃ। এবং বিনাদর্শনীতে এই অন্ধকার-দর্শন উপভোগ করতে হলে এহেন উপাদেয় সুযোগ হাতছাড়া করবার মতো নয় সেকথাও ঠিক, কিন্তু জিগেস করি সবাইকে, এই ট্রাম্টি ছাড়া কি আর ট্রাম্ ছিল না?

চারধার থেকে কোন-ঠেসা হয়ে লেডীজ্ সীটের ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি—দাঁড়াই কোথায়? নড়া-চড়ার পর্যন্ত যো নেই!—আর আমার ঠিক পেছনেই, আমার ঘাড় ঘেঁষে যে-অদৃশ্য ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর প্রাণায়াম-সাধনার বদ অভ্যাস আছে বলে' আমার সন্দেহ হোলো! কেননা যত বারই তিনি নিশ্বাস ফেলছিলেন—প্রত্যেকটাই তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস—তার তোড়ে আমার শার্টের টেনিস্‌কলার্ বাতাহত কদলী-পত্রের মতো পত্ পত্ রবে উড়ছিল এবং কেবল জয়পতাকা উড়িয়েই ক্ষান্ত ছিল না, সেই বায়ুবাণ জামার কলার্—আমার কলার্ বোন্ ইত্যাদি ভেদ করে' সিধে মেরুদণ্ড বেয়ে একেবারে সীমান্ত-প্রদেশে গিয়ে বিঁধ্‌ছিল।

ঘাড়টাকে যে কোথায় সরাঁই—কোন ধারে সরিয়ে রাখি! একটু ঘোরানো ফেরানোরও যো নেই! চারধারেই স্থানাভাব! সাম্‌নে ঝুঁকে একটু কাৎ করে রাখলেই কি, আর পিছনে হেলে কাতর হয়ে থাকলেই বা কি, সেই বাইশ ইঞ্চির তীব্র নিশ্বাস ঝোড়ো হাওয়ার মতো তীরবেগে ছুটে এসে আমার গর্দান্ নিতে কসুর করছিল না!

ট্রামটা হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামল। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের ভদ্রলোকের পশ্চাৎ-ঘাড়ের সাথে আমার চিবুকের অকথ্য এক কলিশন্ ঘটে গেল।

'সরি!' ঢোঁক গিলে আমি বল্লাম।

আমার দোষ।" আওয়াজ এল হেঁড়ে-গলার।

দু' সেকেণ্ড পরে, ডালহাউসি স্কোয়ারের গীর্জাওলা মোড়ের বাঁকটা ঘোরবার মুখে, আমার হাত থেকে শাড়ির মোড়কটা খসে পড়ল। অন্ধকার হাত্ড়ে কুড়োবার চেষ্টা করতে গিয়ে আর একটা অসাধ্যসাধন করলাম—একজনের ভুঁড়ির সঙ্গে আমার শিঙের সংঘর্ষ বাধিয়ে বসলাম। আমার শিং নেই, কিন্তু থাকলে যেখানে থাকতো, সেই সিংহাসন কেঁপে উঠলো।

"সরি!" আমার আর্তনাদ।

"আমারই দোষ"—বল্ল হেঁড়ে গলায়।

ডাল্হাউসি ঘুরে গাড়ি আবার লাট্সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই আমার বাঁ হাতের জিনিসগুলো ডান হাতে বদ্লি করতে গেছি—এমন হাত ব্যথা কর্ছিল! কিন্তু সেই দুশ্চেষ্টা করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারা গেল না। পড়ে গেলাম। কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায়, পড়বার কি ঠাঁই আছে? বাঁ-পাশের একজনের কটিবেষ্টন করে' স্নেহভরে তার বুকের ওপর মাথা রেখে টিকে থাকতে হোলো—একান্ত বাধ্য হয়েই।

সেই অবস্থাতেই বল্লাম: "সরি!"

"সরুন্ না, সরছেন কই?" স্নেহ-ধন্য ভদ্রলোকের হেঁড়ে গলার জবাব পাওয়া গেল—(স্নেহভাজন হয়েও মোটেই তিনি খুশি নন্!): "একটু সরলে তো ভালোই হয়।"

"উঁহু, সে সরি বল্‌চিনে। কোথায় সরি, বলুন্‌?" করুণ কণ্ঠে বলতে হোলো: "বলচি ভেরি সরি। ভারী দুঃখিত।" আমার মানসিক অবস্থা ও শারীরিক অবস্থান সাদা বাংলায় পরিষ্কার করে দিলাম।

"কিন্তু আমার হার্ট উইক যে!" বল্ল হেঁড়ে-গলায়। —"আপনার এই গুরুভার কি আমার সইবে?"

আস্তে আস্তে উঠতে হোলো—দেহের উত্থান-পতন আছে, জাতীয়তাবাদের মতই অনেকটা; কিন্তু হৃদয়ের, সাম্রাজ্যের মতন, একবার পতন হলে আর পুনরভ্যুদয়ের আশা নাস্তি!

এসপ্লানেড্‌ পেরিয়ে মেট্রোর পাশ দিয়ে যাবার প্রাক্কালে ডান দিক থেকে কার একটা আঙ্গুল বলা নেই কওয়া নেই আমার নাকে এসে ঢুকে পড়লো।

"এ কি! ন্যাক নাকি? কার নাক? নাক কেন এখানে? এই কি নাক রাখবার জায়গা?" আঙুলের আস্ফালনের সাথে সাথে হেঁড়ে গলার ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শোনা যায়: "নাক কি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রাখবার জিনিস?"

"কোথায় রাখি বলুন্‌ তো!" অঙ্গুলির আলিঙ্গন থেকে নাসিকা মুক্ত করতে করতে বলি: "নাককে তো পকেটে রাখা যায় না!"

"আপনার দোষ এবার।" ডানদিকের হেঁড়ে গলা জানালেন।

"মঞ্জুর!" আহত নাকের শুশ্রূষা করতে থাকি, "মেনে নিচ্ছি।"

"খবরদার এমন করবেন না। যেখানে সেখানে নাক ফেলবেন না আর। আমার আঙুলে লেগেছে।"

"হ্যাঁ,—হ্যাঁ—হ্যাঁচ্ চো!" আমি বলি। কণ্ঠস্বরের দ্বারা সায় দিতে যাই, কিন্তু নাকিস্সুরে কথাটা বেরয়।

"মাপ করবেন!" নিশ্বাসের ঝড়ে এতক্ষণ ধরে যিনি আমার হাড় পাঁজরা ঝরঝরে করছিলেন পেছন থেকে তিনি বল্লেন: "আপনার খুব ঠাণ্ডা লাগছে বোধ হয়? কিন্তু কি করি, আমার কোনো দোষ নেই।"

এই বলে' তিনি প্রকাণ্ড এক সাইক্লোন্ পরিত্যাগ করলেন। আমার মেরুদণ্ডের আনাচে কানাচে কাঁপুনি ধরে' গেল।

"দেখুন, যদি দয়া করে' এই ঝড়ের ঝাপ্টাটা অন্যদিকে চালিয়ে দিতে পারেন।" সবিনয়ে আমি জানাই: "এই ডান দিকের কান ঘেঁষে একটু?"

"মাপ করবেন। আমার ঘাড়ের ওপর একটা কনুই! কার কনুই জানিনে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ঘোরানোর আমার উপায় কি!"

"তাহলে আমাকেই মাপ করবেন। অনুরোধ করার ত্রুটি হয়েছে। আমারই দোষ।" আমি অপরাধ স্বীকার করি।

"মঞ্জুর !" পেছনের তরফ থেকে জবাব এল হেঁড়ে গলায়।

আর ঠিক এই মুহূর্তে, মেয়েলি মিষ্টি গলায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। পাশের লেডীজ্ সীট থেকেই উঠল হাসিটা !

এরপর দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হোলো না। যে অনিবার্য কারণে গ্রহনক্ষত্ররাও পথভ্রষ্ট হয় সেই অদম্য

আকর্ষণে আমিও কক্ষচ্যুত হয়ে বসে পড়লুম। সেই মেয়েলি আসনের এক পাশটিতে। অন্ধকারে কে দেখচে ?

প্রায় পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে পড়েচি তখন। দেখতে দেখতে লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় পেরুল। অন্ধকারে মনশ্চক্ষু চালিয়ে যতটা দেখা যায়—সময় আর ট্রামগতির আপেক্ষিক সম্পর্কের অঙ্ক কষে আমার স্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা।

এর পর যত ধাক্কা, যত কিছু আঘাত, যত না ঝঞ্ঝাবাত আসুক্—আমার থোরাই কেয়ার! কোনো ঝঞ্ঝা কোনো ঝঞ্ঝাটই আমি গ্রাহ্য করিনে। কিছুকেই আর আমার পরোয়া নেই! সঙ্গিনী কেউ থাকলে সঙ্গিনের খোঁচাও মিষ্টি! কিন্তু না, ঝড়টা এখন আমার মাথার ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে—নৈঋত কোণ দিয়েই কেটে যাচ্ছে মনে হয়—টের পাচ্ছিনে আমি।

এতক্ষণে হাত পা গুলোকে একটু বিশ্রাম দেওয়া গেল। নাকটাও খানিকটা নিরাপদ! অন্ধকারে প্রায় সমস্তই বেহাত হবার দাখিল হয়েছিল। কিন্তু যাক্ আর নাকাল হবার দায় নেই।

ডান হাতটাকে আসনের মাথায় আয়েষ করে ছড়িয়ে দিলাম। ঠেসান্ দিয়ে বসা গেল—আঃ! নরম সিল্কের পরশ বাহুর গায়ে এসে লাগে,—সিল্কের চেয়েও নরম, খোঁপার ছোঁয়া কখনো কখনো।

সুগন্ধির মৃদু সুরভি নাসিকাপথ মুক্ত পেয়ে চেতনাকে

ডিঙিয়ে অবচেতনায় গিয়ে বিদ্ধ হতে থাকে। বুদ্ধি শুদ্ধি সব গুলিয়ে যায়।

আমার মুখ ছোট্ট একটা কানের একেবারে কাছাকাছি! ছ'ইঞ্চির ফারাক্ থেকে, মাঝে মাঝে, সিকি ইঞ্চির ব্যবধানে এসে পৌঁচচ্ছে! এমন অবস্থায় রক্তে উন্মাদনা জাগা স্বাভাবিক। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করলেও কেউ বিস্মিত হবে না।

এজাতীয় বিপাকে পড়লেই তো মনের মধ্যেকার নিদ্রিত পশুরা সব জেগে ওঠে,—তাই না? এমন গাঢ় অন্ধকার আর এতখানি প্রগাঢ় সান্নিধ্য—এরকম মাহেন্দ্রক্ষণে কী থেকে কীই না ঘটে যায়! কী পাইনি, ভবিষ্যতে বসে' তার হিসেব মেলাবার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে না। যা পাবার, আর যা পাবার নয়, সব নগদ আদায় করে।

প্রাণের মায়া ছেড়ে আমি—আমি—সেই কানের ওপরেই একটা—

যা আমার পাওনা নয় তাই উসুল করি! ভৌগোলিক বিধি অমান্য করে' আমার খাইবারপাশ ওর কর্ণাট প্রদেশের সীমান্ত লঙ্ঘন করে।

"এরকমটা আমি আশা করিনি!" চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে' মেয়েটি বলে।

উত্তর এবং দাক্ষিণ্যে চাপা, সেই কোমল অনুযোগের কোনো জবাব দেবার আগেই, আমার বাঁ পাশ থেকে—মাঝপথে

ত্রিশঙ্কুর মত ঠাসাঠাসি করে' যারা দাঁড়িয়েছিল মধ্যপন্থী সেই মধ্যস্থদের একজনের দ্বারা—সজোর এক ধাক্কা এল। তার তাড়নায় আমি একেবারে মেয়েটার গায়ের ওপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

"আমার দোষ এবার।" হেঁড়ে-গলার উৎফুল্ল উচ্চনাদ: "যাক্, এতক্ষণে শোধবোধ।"

অচিন্তিতপূর্ব এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি অভাবিত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম—আমি আর মেয়েটি একসঙ্গে। (দুর্ঘটনারা একলা আসে না, কে না জানে?) আমার জর্জরতা থেকে মেয়েটিকে মুক্তিদানের সাথে সাথে কৈফিয়ৎ দিই:

"আমাকে ওপাশ থেকে ঠেলে দিয়েছে। আমি···আমার···" আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌তে যাই।

"আমি কিছু মনে করিনি।" খুব নীচু খাদের বীণাধ্বনি কানে এল।

"আপনাকে তো আর টের পাওয়া যাচ্ছে না মশাই! গেলেন কোথায়?" হেঁড়ে-গলার সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা।

"হারিয়ে যাইনি, রয়েছি ঠিকই।" আমি জানাই। পত্রপাঠ জানিয়ে দিই। এই রমণীয় পরিবেশের মাঝখানে কথা বাড়াতে ভালো লাগে না।

আর এমন আশ্চর্য লাগে! চেনা অচেনায় জড়ানো অদ্ভুত এই মেয়েটি! কিরকম মিষ্টি গলা আর কেমন ওর মিষ্টি গন্ধ!

সুরের ছোঁয়া সুরভির ছোঁয়াচ লেগে, নরম গালের নাগালে, কোন্ এক রহস্যময় জগতকে যেন জাগিয়েছিল। ফাঁকা আকাশের মত চিরন্তন, মাধ্যাকর্ষণের মত মারাত্মক তার টান!

"আমি যদি আমার হাতটা এম্‌নি করে রাখি—" উদাহরণ-স্বরূপ আমার ডান হাত দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে বলি—"তাহলে বোধহয় হঠাৎ ওরকম ধাক্কা লাগার ভয় থাকে না?"

সেই ঘোরালো অন্ধকারে এর চেয়ে জোরালো আর কী করার ছিল? আর কী করা যায়? দারুণ দুর্যোগে, পুরুষের সবলবাহু, এই ভাবেই কি চিরদিন অবলাদের রক্ষা করে আসে নি?

"কতক্ষণে এটা তোমার মাথায় খ্যালে, তাই আমি ভাবছিলাম।" মৃদুস্বরে বল্ল মেয়েটি।

"ও—আপনি বসে' পড়েছেন দেখ্‌ছি! বসবার জায়গা ছিল না কি এখানে?—" হেঁড়ে-গলা দুঃখ প্রকাশ করেন: "আমিও তো সন্ধ্যের মুখেই ট্রামে উঠেছি মশাই, দেখতে পাইনি তো!···আমারই দোষ।"

"উঁহু, আপনার নয়, বরাতের!" আমার সান্ত্বনা-প্রদানের অপচেষ্টা: "কারু সর্বনাশ আর কারু—"

এবং সেই অন্ধকারে, নিজের বাহুবেষ্টনীর অন্তর্গত হয়ে, পূর্ণ-থিয়েটারের মোড় থেকে শুরু করে' লেক্ রোড়ের বেড় পর্যন্ত—একবার না, দুবার না, বারম্বার—কিন্তু সে পৌষ-পার্বণের কথা সবাইকে ফলাও করে বলার নয়।

কোনরকমে ভীড় ফাঁক করে' সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের মোড়টায় নেমে পড়লাম আমরা।

"ভাগ্যবান্ ছোকরা!" দ্বিধাগ্রস্ত জনতার মুখপাত্ররূপেই, বোধকরি, হেঁড়ে-গলার বিবৃতি বেরিয়ে এল।

টালীগঞ্জের ট্রাম্ আরো বেশি জমাট অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়, যেতে যেতে আমরা দেখি।

"যুদ্ধ জিনিসটা ততো খারাপ নয় যাই বলো!" কোমল-করপল্লবে আমার বাহুগ্রাস করে' মেয়েটি বল্ল: "যার ফলে মানুষরা পরস্পর এত কাছে—এরকম কাছাকাছি আসার সুযোগ পাচ্ছে—তাকি খারাপ? তোমার কী মত?"

"আমি? এই যুদ্ধ চিরকাল ধরে চলুক, আর এই পাশাপাশি আসাআসি চলতে থাক, মা রণচণ্ডীর কাছে এই শুধু আমি প্রার্থনা করি।" একবাক্যে ওর কথায় আমি সায় দিই।

আর এই বলে' বাহুগ্রস্ত সহধর্মিণীকে আরো সবলে বগল-দাবাই করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে বাড়ির দিকে পা বাড়াই।
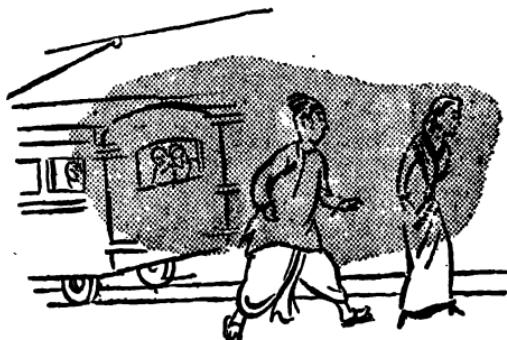
ষষ্ঠ পর্ব
উপাখ্যান

বিটকেল্ আওয়াজে সেদিন সকালের ঘুম ভাঙ্‌ল। আওয়াজটা পিছনের বাগান থেকে লাফিয়ে উঠে শোবার ঘরের জানালা ভেদ করে' বর্শার মত আমার কর্ণমূলে এসে বিঁধ্‌ল। কল্পনার তারস্বর তাতে ভুল নেই, কিন্তু কতটা বীরত্বঘটিত হলে তা তীরস্বরে পরিণত হতে পারে কল্পনাতেও কোনদিন ছিলনা। সেই মুহূর্তে স্বকর্ণে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গেল।

এবং শুধু কাল্পনিক কণ্ঠই নয়, সেই সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আরেক কেকা-ধ্বনি! আন্‌কোরা অচেনা গলার কক্ কক্। সঙ্গে সঙ্গে নীচের ঘরে সশব্দে দরজা বন্ধ হওয়ায় খবর পাওয়া গেল। তারপর সব চুপ।

তীরস্বর শুনেই, কল্পনা ধনুর্ধরের মত কিছু একটা করেছে টের পেয়েছিলাম। জানালা খুলে মাথা বাড়িয়ে খোঁজ নিলাম।

"কার সঙ্গে আলাপ করছিলে গা?"

"একটা পাখী ধরেছি।" কল্পনা ব্যক্ত করল।

"পাখী? কী পাখী?"

"দেখে যাও এসে। পুরে রেখেছি আমাদের বোটুক-খানায়।" নামলাম নীচে। কল্পনা খুব সাবধানে বৈঠকখানার দরজা দেড় ইঞ্চিটাক্ ফাঁক্ করল। সাহসে বুক বাঁধতে হোলো আমায়। কে জানে, একটা ঈগল কি উটপাখীই হবে হয়ত; তাড়া করে' আসে যদি? যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে' সেই দেড় ইঞ্চি ফাঁকের ভেতর দিয়ে আধ ইঞ্চি দৃষ্টি চালিয়ে দিলাম। বহু চেষ্টার পর, টেবিলের আড়ালে, আমার গদি আঁটা চেয়ারে উপবিষ্ট পাখীর মত চেহারার একজন আমার চক্ষুগোচর হোলো।

পাখীর মত হাবভাব, কিন্তু পাখী কিনা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। পাখীর মত চেহারা, পাটকেলের মত রঙ্ (ইঁটের মতও বলা যায়), হাতলের তলা দিয়ে প্যাঁট্ প্যাঁট্ করে' আমার দিকে চাইছে। ভারী বিরক্ত চাউনি। আর জলের কলের দম বন্ধ হলে যে রকম বকুনি বেরয় অনেকটা সেই জাতীয় বক্-বক্-নিনাদ!

"কী পাখী?" জিজ্ঞেস করল কল্পনা।

সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যতটা পারা যায়, পক্ষী-আকারকে আমি মনে মনে পরীক্ষা করলাম।

"পাখী বলেই তো বোধ হচ্ছে।" আমি বল্লাম।—"উড়ে এসেছিল, না কি?"

"প্রায় উড়েই এল বইকি!" জবাব দিল কল্পনা: "কিম্বা

কেউ ছুঁড়ে দিল যেন। বোকেন বাবুদের বাগানের দিকটা থেকে এল।”

“ছাখো, এখানে আমরা ফেরারী হয়ে এসেছি।—” আমার প্রখরদৃষ্টির খানিকটা পাখীর থেকে টেনে কল্পনার মুখে নিক্ষেপ করি।—“এখনো এখানকার সকলের সঙ্গে ভালো পরিচয় হয়নি। এস্থলের ইতরভদ্র প্রাণীদের কে কি ধরণের কিছুই জানিনে। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত কাউকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেয়া কি ঠিক হবে? চোখ কান ঠুক্‌রে নেয় যদি?”

বাস্তবিক্‌, ইভ্যাকুয়েশনে আসা আর খুন করে’ পালানো আসামীতে কোনো প্রভেদ নেই। কারো তারা প্রীতিভাজন না। সবাই তাদের বিষনজরে ছাখে। স্থানীয় বাজার-দর বাড়ানোর কারণ বলে’ বাজারের কারো কাছে তাদের আদর নেই। এমনকি, ওই পাখীটা পর্যন্ত ছাখো না, দুই চোখে বিদ্বেষ উদ্‌গীরণ করছে! ভেবে দেখলে, বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে শেষে এই বিভুঁয়ে এসে বুনো পশুপক্ষীর গর্ভে যাওয়া কোনো কাজের কথা বলে’ আমার বোধ হয় না। অপরের জিভে নিজের স্বাদ গ্রহণ খুব উপাদেয় নয়, অন্ততঃ নিজের জিভে অপরকে আস্বাদ করার মত ততটা নয় বলেই আমার আন্দাজ।

“ধরো, যদি কোনো রকমের বুনো হাঁস টাঁস হয়? ডিম পাড়ে যদি?” কল্পনা নিজের পরিসীমা বাড়ায়: “এখানে তো

কিছুই মেলে না। খাদ্য-সমস্যাটা কিছুটা তো মিটতে পারে তাহলে ?”

বল্‌তে কি, এই জন্যেই ওকে আমি এত ভালবাসি। আমার বুদ্ধির অভাবের কিছুটা ওর দ্বারা মোচন হয়। আমার বোকামির ও ক্ষতিপূরক। আমার অনেকখানি প্রতিষেধক, বল্‌তে কি !

আমার যেসব বন্ধু নামজাদা মেয়েদের বিয়ে করেছিল, যারা সান্ত্বনা, স্নেহ, সুরমা বা লাবণ্যলাভ করেছিল, তৎকালে মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করলেও এখন আর সে বিষয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। সেই সব স্নেহধন্যরা সুখে থাকুন। তাঁদের নিজেদের সুরম্য-উপত্যকায় বিরাজ করুন আনন্দে। সেই সান্ত্বনাদাতাকেও (যিনি মুখেই খালি সান্ত্বনা দিতেন, সত্যিকার সান্ত্বনা যাঁর কাছ থেকে কোনোদিন পাইনি) অকাতরে আমি এখন মার্জনা করতে পারি। এমনকি, আমার যে-বন্ধুটি কেবল বিয়ের দৌলতেই প্রতিভাবান বলে’ বিখ্যাত হয়েছেন (হতে বাধ্য), তাঁর প্রতিও আমার আর ঈর্ষা নাই। কল্পনা-প্রবণ হয়েই বেশ আমি আরামে আছি।

কল্পনার তারিফ করতে হয়। ডিমের দিকটা আমার একদম্ খেয়াল হয়নি। ভাবনার দিকটাই ভেবেছি। সম্ভাবনার দিকটা ঠাওর হয়নি। কি করে হবে, ওর মত অমন মর্মভেদী দৃষ্টিভঙ্গী আমার কই ?

"থাক্ তাহলে। কিছু পাড়ে কিনা, দেখা যাক্।" আমি বল্লাম: "ওই বোটুকখানাতেই বসবাস করুক্। আমাদের বোটুকখানায় এইতো প্রথম এখানকার সামাজিক পায়ের ধূলা পড়লো!"

বিকেলে স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে বোকেনের সঙ্গে দেখা। (মফঃস্বলে স্টেশনই হচ্ছে একমাত্র গম্যস্থল—ঠিক রম্যস্থল না হলেও—ওছাড়া আর চরবার জায়গা কই? সেখানে ঢাকুরিয়ার মত লেক্ নাস্তি, অন্ততঃ বর্ষাকাল না এলে দেখা যায় না, কাজেই সুন্দর মুখ দেখতে হলে রেলগাড়িই শুধু ভরসা! তাছাড়া, থিয়েটার যাত্রা সিনেমাও দুর্লভ—রেলগাড়ির প্রবেশ ও প্রস্থানেই যা কিছু যাত্রা ইত্যাদি নজরে পড়ে।)

বোকেন আমার দিকে ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে তাকিয়ে থাকল খানিক। তারপর মুখভাব যারপরনাই কঠোর করে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল যেন: "আমার বন্য কুক্কুট কোথায়?"

"বন্য কুক্কুট?" আমি বোকা সাজলাম: "বন্য কুক্কুট আবার কি হে?"

"ন্যাকা! ওসব ইয়ার্কি চল্‌ছে না। আমার বালিহাঁসটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো।"

যখন এইভাবে আমার প্রতি লালবাজার-সুলভ-জেরা চল্‌ছে

ঠিক সেই মুখে যতীন এসে হাজির। তার মুখেও কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব।

"তোমাদের বালিহাঁসের কথায় মনে পড়ল। তোমরা কেউ আমার সখের পারাবতটিকে দেখেচ?" বল্ল সে।

"পারাবত? তার মানে? পারাবত তো পায়রা।" আমিও না বলে' পারিনা: "মোটেই পায়রার মতো দেখতে নয়।"

যতীন আর বোকেন—দুজনেই চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।

"নয়ই তো।" যতীন একমুখ হাসি এনে ফ্যালে: "উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে হয় পায়রা; আর গৃহপালিত হলে হয় কপোত। গৃহকপোতী বলা হয়ে থাকে শোনোনি! সেই বস্তুই আবার পাড়ার বাইরে পাওয়া গেলে পারাবত। এই বেড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয় যেমন হে!"

"কক্ষনো তা নয়। তোমার বন্যকুক্কুটও না…আর…আর তোমার বুনো পায়রাও নয়। সারস পাখী আমি কখনো চোখে দেখিনি, যদি হয় তাহলে তাই।"

ধরা পড়ে যাবার পর আর পিছিয়ে আসা যায় না। সাফাই দিতেই হয়।—"তবে যদি বন্য সারস হয় তো বল্‌তে পারিনে।" সেই সঙ্গে এটুকুও অনুযোগ করি।—"বুনোদের সঙ্গে তো এইখানেই আমার আলাপ!"

ওদের গোয়েন্দা-মার্কা চাউনি তখন পরস্পরের ওপরে পড়েছিল। পরস্পরকে সন্দেহ করছিল ওরা। উভয় পক্ষ থেকেই বিপক্ষতায় কোনো ত্রুটি হোতো না, মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াত কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ট্রেন এসে পড়ে বাধা দেয়ায় লড়াইটা থেমে গেল।

কুরুক্ষেত্র থেকে আমরা ধর্মক্ষেত্রে চড়াও হলাম। সন্ধি করে ফেল্‌লাম। সকলের জবানবন্দী জোড়াতালি দিয়ে জানা গেল, যতীন ঐ পাখীটাকে কাল সন্ধ্যায় তার বাগানে উঁকি মারতে দেখেছিল। তার ধারণায়, পাখীটাও আমাদের মতই পলাতক, তবে ধারেকাছের নয়, সুদূর থেকে আসা, বর্মা মুলুকের আম্‌দানি হওয়াই সম্ভব। আর বোকেন আজ সকালে পা টিপে টিপে তার বাগানের সীমান্তে পৌঁছে পাখীটাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল আর কি, সেই সময়ে পাখীটা কেমন করে' তার হাত ফস্‌কে (পাখোয়াজির কোথাও গলদ্‌ ছিল নিশ্চয়) বেড়া টপ্‌কে আমাদের এধারে এসে পড়ে।

একজনের প্রথম দর্শন, অন্যজন থ্রি-ফোর্থ্‌ ধরে ফেলেছিল, আরেক জনের কাছে ধরা দিয়েছে—অধিকারসূত্রের এরকম ঘোরপ্যাঁচে—পাখীটা আপাতত আমার আস্তানাতেই বাস করবে স্থির হোলো।

বাড়ি ফিরে জানলাম কল্পনা ইতিমধ্যেই ওর নামকরণ করে'

ফেলেছে। মীনাক্ষি! নামটা খুব অযথা হয়নি। প্রথম দেখা থেকেই ওর চাউনিতে, বিশেষ করে' আমার প্রতি ওর হাবভাবে বিজাতীয় একটা মীন্‌নেস্ আমি লক্ষ্য করেছি। মিনেসিং সাম্‌থিং, ভাষায় ঠিক তার প্রকাশ হয় না। মীনাক্ষি বললেই ঠিক হয়।

"ওকে আমাদের খাবারঘরে এনে রেখেছি।" কল্পনা বল্ল ঃ "বোটুক-খানায় ভারী একা একা বোধ কর্‌ছিল বেচারা।"

"তা, বাগানে কেন ছেড়ে দিলে না? নিজের মনে বেড়িয়ে বেড়াতো।"

"বাগানে? আমার সাহস হয় না বাপু। কেউ যদি নিয়ে পালায়?"

সে কথা ঠিক। এ যা বাগান! বাড়ি ভাড়া করেই একটা বাগানবাড়ি পেয়ে গেছি বটে—বাগানটা ফাউয়ের মধ্যেই—তবে এ-অঞ্চলে বাড়িমাত্রই বাগানবাড়ি। চার ধারে ঘেরা বেড়া দেয়া থাকলেও, এসব বাগান তৈরি-করা না স্বয়ংসৃষ্ট বলা কঠিন। ঝোপ্-ঝাড়-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে এক একটা মনুষ্যাবাস। তার ভেতরে কোনোটা বাংলোপ্যাটার্ণ, কোনোটা একতালা, কোনোটা বা আটচালা, কদাচিৎ একখানা দোতালাও। কিন্তু এগুলো যে কিসের বাগান—বাগানের কোন্‌টা যে কী গাছ তার ঠিকুজি ঠিক করা আমার পক্ষে বাতুলতা। পত্র-পাঠ গাছ চেনা আমার অসাধ্য (প্রকৃতিরসিক আমাদের বিভূতিবাঁড়ুজ্যে

মশাই-ই শুধু তা পায়েন)—গাছ আমার কাছে ওষুধের মতোই—সেই রকম ত্যাজ্য এবং কেবল ফলেন পরিচিয়তে। গাছের কর্মফল না দেখে এবং স্বয়ং ফলভোগ না করে' কিছুতেই গাছ চিনতে পারি না। কিন্তু এসব গাছের ফল দেখব তার যো কি! তলায় পড়া দূরে থাক্, গাছেই ভালো করে' ধরতে পায় না—পাড়ার ছেলেরা এসে দেখতে না দেখতে ফাঁক করে দেয়। গাছে গাছেই তাদের ফলার, এসব বাগান হচ্ছে 'মা ফলেষু কদাচন'। একমাত্র গীতার কর্মযোগী ছাড়া আর কেউ যে অস্মিন্ দেশে বাগান করার উদ্যোগ করে না তা নিশ্চয়। এখানে হচ্ছে একজনের বাগান এবং আর-সবার বাগানো। এ-বাগানে যদি পাড়ার ছেলেরা এসে এই বেপাড়ার পারাবতকে একলাটি ঘুর ঘুর করতে দেখে তাহলে যে এক মুহূর্ত ছেড়ে কথা কইবে না সে কথা খাঁটি।

খাবার সময়ে দেখা গেল মীনাক্ষি অতিশয় অবজ্ঞাভরে রেডিয়োর ওপরে বসে রয়েছে। আক্রমণাত্মক কোনো লক্ষণ ওর দেখা গেল না। যতটা মারাত্মক ভাবা গেছল তা নয়; নিতান্তই নিরীহ একটি বন্য পারাবত। (পারাবত বা যাই হোক্!) ক্রমেই দেখি মীনাক্ষি এগিয়ে এসে আমাদের থালার থেকে খাবার খুঁটে নিতে লাগল।

দেখতে দেখতে আমরাও মীনাক্ষির আসক্ত হয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় দিনেই অদ্বিতীয় পাখীরূপে ও আমাদের জীবনে কায়েম হোলো। একটা বুনো সারস (অথবা বালিহাঁস যাই হোক্)—যদিও কিঞ্চিৎ মনমরা—তবু গার্হস্থ জীব হিসাবে নেহাৎ মন্দ না। আর যাই হোক্, যখন তখন ঘেউ ঘেউ বা ম্যাও ম্যাও নেই, কাউকে ধরে কামড়াবে না, কিম্বা পাড়াপড়শীর বাড়ি গিয়ে চুরি করে' দুধ মেরে আসবেনা। পাড়াতুত গণ্ডগোল ল্যাজে বেঁধে আনবে না। একটা কক্‌ককে আওয়াজ আছে বটে কিন্তু বক্‌বক্ কম করে। তেমন বক্তা নয়, গানের আপদ নেই, স্লোগানের বালাইও না।

পাখীটার আমরা প্রেমেই পড়ে গেলাম, বল্‌তে কি! আমাদের পোষ্যকন্যারূপে ওকে গ্রহণ করারও প্রায় মনস্থ করে' বসেছি এমন সময়ে বোকেন আর যতীনের তরফ থেকে বাধা এল।

বোকেন এসে বল্লেঃ "বাঃ বাবা! খাসা চালাচ্ছো! দিব্যি একটা খরচ বাঁচিয়ে ফেল্লে! বেশ বেশ!"

"ডিমের ভাবনা রইলো না! মন্দ কি!" যতীন যোগ দিল সেই সঙ্গে।

"তুখোর ছেলে! তবে একটু চশম্‌খোর, এই যা!" বোকেনের বক্র কটাক্ষ।

"তোমরা বল্‌চ কি?" আমি আকাশ থেকে পড়ি।

"বল্‌ব কি আর! ভাগ্যবানের ডিম ভগবানে যোগায়।

তবে কথাটা এই, অপরের সম্পত্তি থেকে যোগান্‌টা আস্‌ছে এই যা।"

"ডিম?" আমার চমক্ লাগে: "তোমাদের কি ধারণা যে—"

"আরে না না!" বোকেনেয় ঠাট্টার স্বর: "তুমি কি আর ডিমের লোভে—কে বলে! তোমার দাতব্য অতিথ্‌শালায় গৃহহীন বন্য কুক্কুটরা এলে অম্‌নিই আশ্রয় পায়।"

"গার্হস্থ চিড়িয়াখানা বলো।" বল্ল যতীন। "ওদের দুজনকেই বা বাদ দিচ্ছ কেন!"

এই রকম দিনের পর দিন ওদের কচ্‌কচি শুনতে হয়, অথচ মীনাক্ষি এদিকে একদিনও একটা ডিম পাড়েনি। ডিম তো পাড়েইনি, তার ওপরে কদিন থেকে এমন মেজাজ দেখাতে আরম্ভ করেছে যে আমরা আর ওকে তালা দিয়ে রাখতে চাই না—বরং তালাক্ দিতে পারলেই বাঁচি। এমন স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব একগুঁয়ে পাখী এর আগে আর আমার নজরে পড়েনি—মনুষ্যত্ব দূরে থাক্, পক্ষীত্বের লেশমাত্রও ওর নেই।

"আজ্‌কেও ডিম পেড়েছে তো?" এই প্রশ্ন মুখে করে' একদা প্রভাতে যেই না বোকেনের প্রাদুর্ভাব, অম্‌নি না আমি অম্লানবদনে মীনাক্ষিকে ওর করকমলে সম্প্রদান করে' দিয়েছি। যতীনকে সাক্ষী করে'।

এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে বল্‌তেও দ্বিধা করিনি: "তোমাকে

জামাই করতে পারলুম না, দুঃখ থাকল। কিন্তু এই আমার

অনুরোধ, আমাদের মীনাক্ষিকে তুমি সুখে রেখো। আমি

মীনাক্ষি-মাকেও বলি, ও তোমার জন্য নিত্য নিয়মিত ডিম পাড়ুক।"

ডিমের ওর বাড়-বাড়ন্ত হোক্, সর্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনা করে' মীনাক্ষিকে ওর সমভিব্যাহারে দিলাম। এবার ওর সুর বদ্‌লায় কিনা দেখা যাক্। দিন কয়েক গেল, বোকেনের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তবে কি মীনাক্ষিই তার সুর বদ্‌লালো না কি?

"কি হে, কিরকম ডিম্বলাভ চল্‌ছে?" কৌতূহলী হতে হোলো আমায়।

"প্রত্যেকদিন একটি করে'—ফাঁক্ নেই!" বোকেন সহাস্য-বদন, "বন্যকুক্কুট হলে কি হবে, সভ্যতায় অভ্রভেদী!"

"বলো কী!" বিস্মিত না হয়ে পারি না।

"তুমি একটা অপদার্থ! কি করে' ওদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় জানো না। রাত দিন রেডিয়োর বাক্সয় বসিয়ে রাখলে কি আর ডিম পাড়ে? গানের দিকে কান থাকলে ডিমের দিকে মন দিতে পারে কখনো? বাগানে দুবেলা দৌড় করাতে হয়। একসারসাইজ দরকার—যেমন আমাদের তেমনি ওদেরও। দুবেলা আমরা ওকে নিয়ে সারা বাগান চষ্ছি—আমি একবেলা, গিন্নী আরেক বেলা। তবে তো ফলছে ডিম!"

বোকেন, ওদের ঘোড়দৌড় দেখবার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ করল, কিন্তু বন্য পশুপক্ষীর কীর্তিকলাপ আর কী দেখ্‌ব?

তাছাড়া মীনাক্ষির আচরণে প্রাণে বড় ব্যথা পেলাম। ও যে এতটা বিশ্বাসঘাতক আর নিমক্‌হারাম্‌ হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। আর অমন পাখীর মুখ ছাখে?

সমস্ত শুনে যতীন তো খাপ্‌পা। "বাঃ, মীনাক্ষি ওর একলার না কি? ওতো এজ্‌মালি সম্পত্তি। কেন, আমাদের কি বাগান নেই, না, আমরা ঘোড়দৌড় করাতে জানিনে? আমাকে যদি ও মীনাক্ষির ভাগ না দেয় তো আমি সোজা আদালতে যাব। আমার সাফ্‌ কথা বলে রাখলাম।"

ঘোড়দৌড়টা আদালতের দিকে গড়ালে নেহাৎ মন্দ হয় না, এবং দৌড়বাজিতে ঘোড়ার সংখ্যা যত বাড়ে দৃশ্যহিসাবে ততই আরো দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভাবনাটা বোকেনের কাছে গিয়ে ব্যক্ত করতে—চেহারা ও নামের মধ্যে যতটা আশ্বাস ছিল আসলে ও তত বোকা নয় দেখা গেল—সে বলে' ওঠে—"ঠিক কথাই তো! কালকেই মীনাক্ষি ওর বাগানে যাবে, আসছে হপ্তাটা ওর পালা! মীনাক্ষি এই ভাবে আমাদের সবার হাত ঘুরবে, সেই তো ন্যায্য!"

বোকেন তার কথা রাখল। রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্র, মীনাক্ষিকে স্বহস্তে যতীনের হাতে স'পে দিয়ে এল।

·

বিকেলের দিকে স্টেশনে আমাদের দেখা হতেই, বোকেন আমাকে আড়ালে ডেকে বল্লে: "ওহে শোনো, তোমার সঙ্গে

আর ছলনা করতে চাইনে। তুমি ঠিকই বলেছিলে। মীনাক্ষি একদম্ বাঁজা।”

“তবে এই যে বল্লে সেদিন, তোমার প্রক্রিয়ায় বেশ সুফল দেখা দিয়েছে!”

“কাঁচকলা! তোমাকে যা বলেছিলাম তা স্রেফ্ প্রচার কার্য। সিনেমা কোম্পানিতে পাব্লিসিটি অফিসারের চাক্রি করতাম সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ? আর, কথাটা রটিয়েছি ওই যতনেটার জন্যেই। মীনাক্ষি ডিম পাড়ছে জান্লে ও নগদ টাকায় আমাদের অংশগুলো কিনে নিতে রাজি হবে। ওর যা ডিমের লোভ! দেখো, ঠিক ও মীনাক্ষিকে একচেটে করে' নিয়েছে, তুমি দেখে নিয়ো।”

“কিন্তু মীনাক্ষি যদি ডিমই না পাড়ে—” আমি হতবুদ্ধি হই।

“তোমাকে কি আর সাধে বোকা বলি!” বোকেন বল্ল: “আরে, না পেড়ে যাবে কোথায়? ওরা কর্তাগিন্নীতে দুবেলা মীনাক্ষির সঙ্গে হান্ড্রেড্ ইয়ার্ডস্ দেবে তো—সারা দিন বাগানেই ছাড়া থাকবে মীনাক্ষি। সেইসময়ে কোনো ফাঁকে বাগানের কোথাও একটা ডিম ফেলে দিয়ে আসার মামলা। সে ভার আমার ওপর থাকল। বুঝলে এবার?”

বুঝলাম বই কি! নাঃ, বোকেন তার নামের দারুণ অমর্যাদা করছে—এইসূত্রে সেই কথাটাও আরো বেশি বুঝলাম।

সেই সঙ্গে, ওর তুলনায়—নিজেকেও নিখুঁতরূপে টের পেলাম এতদিনে।

সপ্তাহ ফুরুতেই যতীনের ওপরে আমাদের নোটিশ পড়ে গেল, মীনাক্ষির পালা তার খতম্।

"তা—তার কি হয়েছে ?" ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল : "কাল সন্ধ্যেয় আমার বাড়ি তোমাদের নেমন্তন্ন। সেই সময়ে সবাই মিলে ভদ্রভাবে মীনাক্ষির বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।"

ওষুধ ধরেচে তাহলে। ও একাই মীনাক্ষির অভিভাবক হতে ইচ্ছুক। শুধু মুখরোচক খাদ্যের সঙ্গে সামাজিক ভদ্রতা মিশিয়ে মীনাক্ষির দরটা ও একটু নামাতে চায় মাত্র—ভেবে এমন হাসি পেল! হায় কালবাদ পরশু সকাল থেকে ডিম পাড়া যখন বন্ধ হবে, তখন মীনাক্ষি প্লাস্ আমাদের প্রতি তার এই আদরের পরিণতি কী দাঁড়াবে তাই ভাবি। যাই হোক্, সান্ধ্য ভোজে তো গেলাম আমরা। বোকেন এবং শ্রীমতী বোকেন ; আমি আর আমার বুদ্ধিমতী।

সন্ধ্যেটা কাটলো বেশ। ভারতীয় চায়ের সঙ্গে স্বদেশী মাংসের পিঠে—খারাপ কি ?

টেবিল থেকে পেয়ালা পিরিচ্ সরে যেতেই বোকেন খুক্-খুক্ একটু কাশ্‌ল। ব্যাস কাশি নয়, ভদ্র কাশি, ভদ্রভাবে আলোচনা শুরু করার পূর্বাভাস।

"আচ্ছা, এইবার আমরা মীনাক্ষির ভবিষ্যৎ নিয়ে"—আরম্ভ করল বোকেন।

শুনে যতীনের শ্রীমতী তো হেসেই কুটোপাটি। যতীনও একটু হাস্‌ল, যৎসামান্য, সচরাচর বুদ্ধমূর্তির আননে যে ধরণের রহস্যময় হাসি দেখা যায়।

"তোমাদের বল্‌তে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু না জানিয়েও উপায় নেই।" বল্ল যতীন : "বেচারী মীনাক্ষির কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"

"য়্যাঁ—?" বোকেনের চোয়াল্‌ ঝুলে পড়ে।

"আমাদের ঈষৎ ভুল হয়েছিল—এমন কিছুনা—এই লাক্ষণিক ভুল।" যতীন তেম্‌নি অমায়িক : "কিন্তু মীনাক্ষি যেদিন আমার হাতে এল, সেইদিনই কলকাতা থেকে আমার শ্যালক এলেন—তিনি ভেটার্‌নারি ডাক্তার। দেখবামাত্রই মীনাক্ষির অবস্থা তিনি ধরতে পারলেন। তখনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল।"

"কী পরিষ্কার হোলো, শুনি?" শুনে আমিও একটু গরম হই। আসল কথার পাশ কাটাবার এই চাল আমার ভালো লাগে না।

"জানা গেল যে—" বল্‌তে দ্বিধা করল না যতীন : "মীনাক্ষি আসলে হচ্ছে মীনাক্ষ।"

এই তথ্যের গূঢ়তা গাঢ় হয়ে যতই আমাদের মর্মে প্রবেশ করে ততই তার মর্মান্তিক তীক্ষ্ণতা আমরা টের পাই।

"ডিম পাড়া তার ক্ষমতার বাইরে।" যতীন-গিন্নী কোন রকমে একটুখানির জন্য হাস্যসম্বরণ করে' আমাদের আলোচনায় এই মন্তব্যটুকু যোগ করতে পারলেন। এবং তার পরেই আরেক প্রস্থ হাসি তাঁকে পেয়ে বস্‌ল আবার।

আমরা আর কোনো কথাটি না বলে' নিজের গৃহিনীদের সংগ্রহ করে উঠে পড়লাম। নিঃশব্দেই।

অমায়িক যতীন আর আহ্লাদে আটখানা ওর বৌ—দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল আমাদের।

বাগানে পা দিয়ে বোকেন বল্লেঃ "যাই হোক্, মীনাক্ষি কোথায়? তাকে দেখচিনে কেন?"

"মীনাক্ষি—" শ্রীমতী যতীন থেমে থেমে জানালেনঃ "সেই পিঠের মধ্যে ছিল।"

"সেও অতীতের কথা। এখন পেটের মধ্যে, সেই কথাই বলো!" বল্ল যতীনঃ "তোমার বন্য সারসটা বেশ সরস ছিল হে।" বলে' কটাক্ষ করল আমার দিকে।

আমরা আর দাঁড়ালুম না। উদরস্থ মীনাক্ষিকে ধরে আমরা পাঁচ জন আমাদের সোজা পথ ধরলুম।

"হ্যাঁ, ভালো কথা।" পেছন থেকে হেঁকে বল্ল যতীনঃ "কদিন ধরে তোমরা যে ডিমগুলো পাঠিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ! সবগুলো ঠিক মুরগীর ছিল না, কয়েকটা হাঁসের

ছোট ডিম ভেজাল দিয়েছিলে ; তার মধ্যে, একটা আবার, গিন্নী বলছিলেন, একটু পচাই নাকি। যাক্‌গে, যা বাজার, আর যেরকম মাগ্যি গণ্ডা, আর যেমন দিনকাল পড়েছে, তাতে ওই নিয়ে আমরা কোনো বচসা করতে চাইনে।”
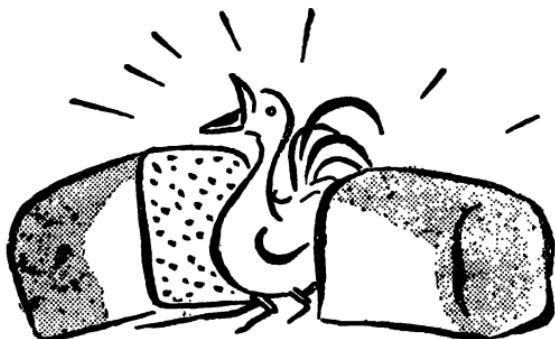
সপ্তম পর্ব

জাড্যদোষ দূর করো !

হাওয়া খাওয়ার মতলবে সেজেগুজে বেরুতে যাচ্ছি, কল্পনা বেড়িয়ে ফিরল। তার মুখে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব। চম্‌কে উঠতে হোলো আমায়। ঝড়ের আগে এমনটাই নাকি দেখা যায়। অবশ্যি আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি (বড় বড় ঝড়রা আমাকে দেখা না দিয়ে—আমার অজ্ঞাতসারে কলকাতার বাইরে বাইরে—মেদিনীপুর প্রভৃতি আশপাশের অঞ্চল দিয়ে কেটে পড়ে—এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করে না)—তবে আমি এইরকম শুনেছি। বইয়েও পড়া আছে বইকি।

"বেরুচ্ছ বুঝি ? কতক্ষণের জন্য ?" জিজ্ঞেস করল ও।

"বেরুচ্ছিলাম তো। তুমি এসে বাধা দিলে।" আমি বললাম : "এখন তুমি যদি অনুমতি দাও তো বেরুই।"

"আমি জাহ্নবীদির বাড়ি গেছলাম।" কল্পনা বলল।

"ও !" স্বরবর্ণে আমার সায়।

"জাহ্নবীদির বর দেখলাম ঘর চূণকাম করতে লেগেছেন।

বাড়ির ভেতরটা প্রায় শেষ করে' এনেছেন—এতক্ষণে বৈঠক-খানাও হয়তো সারা।" বল্ল ও: "আর কী সুন্দর যে ওঁর চূণকামের হাত কী বল্‌ব! আসল মিস্ত্রিদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ঘরদোর যেন ঝক্‌ঝক্ করছে—আহা!"

"বাঃ বাঃ!" আমি সাধুবাদ দিই: "জানতাম আমি—ছেলেটি কাজের। ওর দ্বারা কোনোদিন না কোনোদিন কাজের মত একটা কাজ হবে আমি জানতাম। আমার ধারণা মিথ্যে হয়নি দেখা যাচ্ছে।···ছোকরার নাম কি?"

"আমি জানি নে।" কল্পনা জানায়।

"জহ্নু মুনিটুনী হবে মনে হয়।" আমি অনুমান করি: "জহ্নু মুনিই তো জাহ্নবীকে গ্রাস করেছিল—তাই না?"

কল্পনা সে-পৌরাণিক কিস্‌সায় কান না দিয়ে অন্য কথা পাড়ে: "আমি বল্‌ছিলাম কি—" বল্‌তে গিয়ে সে থেমে যায়।

"যা যা মনে আছে বলে ফ্যালো। মুখে আনতে দ্বিধা কোরো না।" আমি উৎসাহ দিই। কথার আধখানা কাণে এলে আর আধখানা না শোনা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।

"আমাদের ঘরগুলোর ছিরি দেখছ তো? কী বিচ্ছিরি যে হয়ে আছে—দেয়ালগুলোর দিকে তো তাকানোই যায় না। আর রান্নাঘরটা—" এই পর্যন্ত এসে কল্পনা আবার থামে।

"রান্নাঘরের কথা বোলো না। ওদিকে তাকালে আমার কান্না পায়।" ওকে স্থগিত দেখে ওর কথাটা আমিই সম্পূর্ণ

করি ঃ "কিন্তু তোমার জাহ্নবীদির বর কি আর আমাদের ঘরে এসেও হাত লাগাবেন মনে করো? রাজি হবেন কি?"

"তিনি কেন? ···আমি ভাবছিলাম যে তুমি—তুমিও যদি

একটু নিজে লাগো···" ওর মনের কথার বাকী আধখানাও এবার মুখ বাড়ায়—ওর মনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে মুখগহ্বর হয়ে আমার কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করে।

"আমি।" আমি আর্তনাদ করে' উঠি।—"আমি কি পারি?"

"কেন, ক্ষতি কি?" কল্পনা নির্বিকার। "নিজের বাড়ির কাজ নিজের হাতে করবে—লজ্জা কি তাতে?…বাড়ির ভেতরে এসে কেই বা তা দেখতে যাচ্ছে? আর, দেখলেই বা কী আসে যায়? নিজের ঘরের কাজ করছি, কোনো অসৎ কর্ম না।"

"তা নয়। তবে আমার সময় কই?"

"কেন, এই তো সময়! বাজে আড্ডা দিতে না বেরিয়ে এই সময়েই তো করতে পারো। দিব্যি করা যায়। এতো অবসর সময়েরই কাজ।…রোজ একটু একটু করে' করলে একদিনে না হোক একদিন না একদিন হবেই—সারা বাড়িটাই হয়ে যাবে। তোমার অবসরমত করবে—তা হলেই হোলো।"

"অবসর সময়টাই তো আমার কাজের সময়। তখন আমি লেখবার বিষয় ভাবি। আর যখন আমি কাগজ কলম নিয়ে বসি—তোমরা ভাবো আমি কাজ করছি—সেটা হচ্ছে আমার লেখার অবসর। আসল লেখাটা তো আমার তথাকথিত আড্ডার ফাঁকে আর আলস্যের কালেই হয়ে থাকে।"

"অতোশতো বুঝিনে। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? চূণকাম করার অবসরেও তুমি গল্পের প্লট ভাঁজতে পারো। চূণকাম আর কালির কাম কি একসাথে করা যায় না?"

"অবসর সময়ে যদি চূণকাম করলাম তাহলে আর আমার অবসর থাকল কই?…আর তাছাড়া, কোথায় যে চূণ, চূণ

গোলার বাল্‌তি, চূণকাম করার পোচরা এসব পাওয়া যায় আমার জানা নেই। এই যুদ্ধের বাজারে পাওয়াই যাবে কিনা—"

"সেজন্যে ভাবতে হবে না তোমার। সে ভাবনা আমার। জাহ্নবীদির সঙ্গে আমি কথা কয়ে এসেছি। সাজসরঞ্জাম সব মায় ওদের বাড়তি চূণটুকু পর্যন্ত নামমাত্র দামে পাওয়া যাবে—ঢের ওদের বেঁচে গেছে।"

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে—চূণের বালতি সমেত। বাধ্য হয়ে আমাকে সমরকৌশল বদ্‌লাতে হয়।

"চূণকাম করতে আমার বাধা নেই। অক্লেশেই আমি করতে পারি। এমন কিছু গায়ের জোরও লাগে না। এই হাতে, কলমের মত চূণের পোচরা ধরতেও আমি সমর্থ। এমন কি, এই কারণে যদি সাহিত্যের সব্যসাচী আখ্যা আমাকে লাভ করতে হয় তাতেও আমি ভীত হব না। ঐ অপদার্থ জাহ্নবীর বরটা যা পারে তা কি আমি পারিনে তুমি বলো ?"

"আমি তো তাই বলি।" ওর চোখ মুখ আরো চোখা হয়ে ওঠে : "ওগুলো আনানোর ব্যবস্থা করি তাহলে ? কখন থেকে লাগবে ? কাল সকাল থেকেই—না কি ?"

"কক্ষনো না।" আমি জানাই : "ব্যক্তিগত পারা না পারার প্রশ্ন তো নয়—যে কাজ জহ্নু মুনি পারে তা আমিও খুব পারি—এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু এখানে অর্থ-নীতির প্রশ্নেই বাধছে কিনা!"

"অর্থনীতির প্রশ্ন ?" কল্পনা অর্থ বোঝে না। (বিশুদ্ধ অর্থ হলে বোঝে, বেশ টন্‌টনে রকম বোঝে, ইকনমিক্‌সের ছাত্রী, চলিত অর্থ বুঝতে পারে কিন্তু ফলিত অর্থনীতি বোঝে না।)

"সেইজন্যে আমার বিবেচনায় আমি নিজে ঐ চূণে হাত না ডুবিয়ে যদি একজন সাধু সৎসাহসী চূণকামওলাকে ঐ কর্মে লিপ্ত করি সেইটাই বোধহয় সমীচীন হয়।"

"কেন, তোমার হাত লাগাতে কি হচ্ছে ?" কল্পনা গালে হাত দেয়ঃ "কে তোমার হাত ধরে রাখছে ?"

"বল্লাম না—অর্থনীতির প্রশ্ন ?" বলে' কূটতত্বটা, যদ্দূর পারি বিস্কুটের মত সরল আর সুস্বাদু করে' ওকে গেলাবার প্রয়াস পাই। সব কথা বুঝিয়ে অবশেষে বলি—"অর্থাৎ কিনা একটা রাজমিস্ত্রি ঘণ্টা হিসেবে যা রোজগার করে তার তুলনায় আমার প্রত্যেক ঘণ্টার দাম ঢের বেশি। শিল্পীরীতির দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে মহত্তর কিছু সৃষ্টি করি যে—তা আমি বলছিনে, লেখকরূপে তার চেয়ে বড় আসনের দাবীও আমার নয়, সামাজিক প্রয়োজনীয়তার বিচারেও হয়ত আমি ওর চেয়ে ঢের খাটোই হবো—কিন্তু নিছক অর্থনীতিক হিসাবেই আমার সময়ের দাম ওর চেয়ে বেশি।"

এত কথা শুনে ও একটু থ হয়ে যায়। "এখন বুঝতে পারলে তো, আমাকে না লাগিয়ে একজন রাজমিস্তিরি

লাগালে কেন ভালো হয় ?" এই কথা বলে'—বলতে গিয়ে—আমার বেশ একটু গর্বই জাগে বল্‌তে কি !

"তা বেশ। তুমি তবে একটা চুণকামওলাকেই ধরে আনো। আমি ততক্ষণ চূণটুনগুলো আনানোর ব্যবস্থা করি।"

কল্পনা বেরিয়ে গেল। আমাকেও বেরুতে হোলো। রাজমিস্ত্রির অভিসারে। বেরুলাম—অশ্বমেধ করতে কিম্বা গোরু খুঁজতে হলে যেমন হন্যে হয়ে বেরোয়।.........

কল্পনা বলে কিনা, আলস্যে আমি কাল কাটাই! যাদের একটুও কল্পনা-শক্তি আছে তারা কখনো একথা বলতে পারে না। যখন আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করি তখন নাকি শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো আমার কাজ নেই। আরে, তখনই তো আমি কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডময় গল্প হাতড়াচ্চি! এমন কি, যখন আমি ঘুম মারি, সেটাও নিদ্রার ছলনা ছাড়া কিছু নয়। তাকে যোগনিদ্রা বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু সেই নিদ্রাযোগেই গল্পরা আমার মাথায় দানা বাঁধতে পায়! তারপরে, ঘুম থেকে উঠলে, অনেক সময়ে উঠবামাত্রই, কলমের সাহায্যে তারা আমার পানিগ্রহণ করে। এইভাবে গল্পের দানা আর আমার পানি সংযুক্ত হয়ে আমাদের দানাপানির যোগাযোগ। আর যখন আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, তখন তো কথাই নেই। তখন গল্পরাও আমার চারধারে ঘুর্‌পাক্‌ খায়। তখন আর আমাকে গল্প

হাতড়ে বেড়াতে হয় না, তারাই আপনা থেকে আমাকে পাকড়ে ধরে—অবলীলাক্রমে আমার হাতে এসে ধরা দেয়।... হায়, অবোধ কল্পনা!

কিন্তু রাজমিস্ত্রির কাছে গিয়ে অর্থনীতির ধারণা আমার পাল্‌টে গেল। অতি কষ্টে যদি বা একজনকে পাকড়ালাম, তার কিন্তু বহুৎ কাজ। চূণকামের পোচড়া ছুঁতেই সে রাজি নয়। রাঁধুনি যেমন নর্দমা ঘাঁটতে চায় না— যদিও রান্নার শেষ পরিণতি নর্দমায়—তেমনি বাড়ি তৈরির শেষ সীমা চূণকাম হলেও, সীমান্তে গিয়ে মিস্ত্রিত্ব করতে মোটেই ওর উৎসাহ নেই। অবশেষে অনেক করে' যদি বা লোকটা রাজি হোলো, বল্ল, রোজ দুঘণ্টা মাত্র আমায় দিতে পারে, কিন্তু ঘণ্টা পিছু তাকে দু'টাকা রোজ দিতে হবে। যদি সারা বাড়িটা সারতে দশদিন লাগে—দশ দিনের মধ্যেই বাড়ির দুর্দশা দূর করার সে আশ্বাস দেয়—তাহলে থোক্ চল্লিশ টাকা তার এবং আমার ধর্তব্যের মধ্যে। এমন কিছু বেশি নয় আজকালকার বাজারে যদি যাচিয়ে দেখি, সে জানালে।

ভাবতে হোলো আমায়। অর্থনীতির দিক দিয়েই কথাটা ভেবে দেখতে হোলো। ওর দিক দিয়ে চল্লিশ টাকা মাত্র, আমার দিক দিয়ে সেটা যে কতো—চল্লিশবার ভেবে তবেই আমি এগুতে পারি। ভেবে দেখলাম, দশদিনে আমি বড় জোর দেড়খানা গল্প লিখতে পারি—একটার পুরোপুরি,

আরেকটার আধখানা। আমার গল্পের দর উচ্চতম হারে তিরিশ টাকা আর নিম্নতম নিরিখে দু' পাঁচ দশ টাকা,—কখনো সখনো বা ২।০, ৩৸০, এমন কি, এক টাকা সাড়ে পনের আনা অবধি—ছেলেমেয়েদের হাতে-লেখা কাগজ হলেই! আমি তাদের পত্রিকায় অম্‌নি লিখতে রাজি হলেও ছোটরা আমার লেখা বিনামূল্যে নিতে কখনই রাজি হয় না, বোধহয় আমার লেখা অমূল্য বলে' তারা মনে করে না। সে যাই হোক এই কারণে তাদের কাগজে আমার ঐ হার আর তাদের এই জিত।

দুজনের মজুরির তুলনা করলাম—সেই চূণকামওয়ালার এবং এই কালিকামওয়ালা আমার। তার দৈনিক দু' ঘণ্টার দরই দশদিনে চল্লিশ টাকা, আর আমার নিদ্রাজাগরণের হন্দমুদ্দ পরিশ্রম অর্থান্তরিত হলে সর্বোচ্চ দরে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা আর সর্বনিম্ন সমাদরে ২৮৵৫—(যোগটা ঠিক কি না কে জানে!) এরূপ সম্ভাবনাসঙ্কুল আয়ের সমৃদ্ধিশালীর পক্ষে ঐরূপ সামান্য উপায়ের দরিদ্র মজুর নিযুক্ত করা সঙ্গত ঠেকল না। অগত্যা আমি নিজেই চূণকামে লাগব ঠিক করলাম।

তা—চূণের কাজ মন্দ কি? ছোট বেলায় আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বড় হয়ে চূণকামওয়ালা হবো। বাবার কথা হাতে ঠেলে, মিস্ত্রিদের বাধা অমান্য করে প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে বহুৎ দেয়ালে বিস্তর চূণকাম একদা করেছি—সে সব চূণকর্মের ওপর পুনরায় চূণকাম করতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছে অপরকে।

সেই চূণকাম আজ যদি অযাচিতভাবেই আমার হাতে এসে ধরা দেয়, আমার তা সৌভাগ্য বলেই জ্ঞান করা উচিত।

কল্পনাও চূণের বালতি নিয়ে বাড়ি ফিরেচে, আমিও মুখ চূণ করে বাড়ি ফিরলাম। বল্লাম—"তোমার কথাই থাকলো। আমিই লাগবো কাল থেকে।"

কাল থেকে লাগা গেল। একমাস লাগা গেল তবুও এই কালান্তক চূণকাম আর ফুরোয় না। এক জায়গায় জেয়াদা, আরেক জায়গা কম সাদা হয়ে যায়। কেন যে হয় বোঝা যায় না। সাদা রঙেরও আবার রংবেরং আছে—ফিকে সাদা, গাঢ় সাদা, কালচে সাদা ইত্যাদি নানান্ রকমফের আছে আমার জানা ছিল না। সাদায় সাদায় মিল্ মিশ খাওয়াতেই দেদার সময় লাগল। আর যা পরিশ্রম হোলো তার কী বল্‌ব!

দৈনিক দু'ঘণ্টা কি—দশ ঘণ্টা খেটেও কূল পাই না। মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখন বিছানায় গড়িয়ে ঘুমিয়ে নিতে হয়। শুয়ে শুয়ে চূণকামের সমস্যা ভাবি—এমন কি, স্বপ্নেও চূণের পোচরারা এসে দেখা দেয়। দুস্বপ্ন হয়ে খোঁচা মারে! জেগে উঠে ফের আবার হাতে কলমে লাগি—পৌনঃপূণিক চৌনচূণিক প্রবলেম্‌দের সল্‌ভ্ করতে হয়। এক কথায়, আমার চূণান্ত পরিচ্ছেদ!

অবশেষে চল্লিশ দিন পরে কূলের রেখা দেখা দিল। এই

৪০ দিনে আমি একটা লাইনও লিখতে পারিনি। পোচরা ছেড়ে কলমে হাত ছোঁয়াতে পারিনি পর্যন্ত। ঐ হাড়ভাঙা খাটার পর আর কলমভাঙা খাটুনি পোষায় না। হিসেব করে দেখলে অর্থনীতির নিয়মে, এই চল্লিশ দিনে, লেখার বাবদে উচ্চহারে দেড়শ টাকা আর তুচ্ছ হারে এগারো টাকা তের আনা আমার লোকসান হয়েছে আর মিস্ত্রির মজুরি বাঁচিয়ে লাভ করেছি মোট ১৬০৲ টাকা—অন্ততঃ দশ টাকা নেট লাভ।

কল্পনাও ইদানীং অর্থনীতিতে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। এই মাত্র পোচরা ফেলে একটু খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই, সে এসে নেট লাভের হিসাবটা আমায় শুনিয়ে দিল ঃ "এই একশো ষাট টাকা—যেটা বাঁচানো গেছে—তাই দিয়ে আমি গোটা কয়েক শাড়ি আর ব্লাউজ কিনে এনেছি—বুঝেছ? ভাগ্যিস্ তুমি মাথা খাটিয়েছিলে! তাই তো এই লাভটা হোলো। এক মাসে এত টাকা আর কখনো তুমি উপায় করোনি।"

যথার্থ ই!
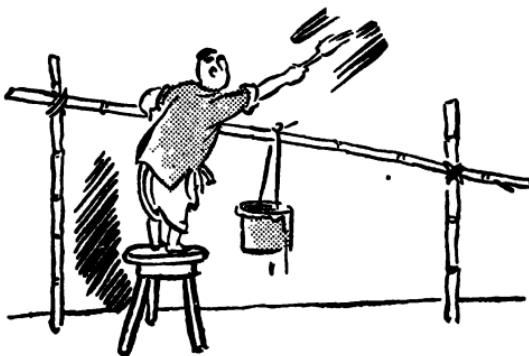
অষ্টম পর্ব

সদা সত্য কথা কহিবে

'সব মেয়েই আমার কাছে সমান।' কে নাকি এই কথা বলে' সুন্দরীদের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার বিচারক-পদের আমন্ত্রণ পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছেন—খবর-কাগজের মারফতে জানা গেল। খুব সম্ভব কোনো নীতিবাগীশ, কিম্বা—কিম্বা কোনো কূটনীতিজ্ঞই কেউ হয় তো! কিন্তু কথাটা শুনে অবধি এ ক'দিন ধরে আমার এমন মাথা ধরে রয়েছে—এমন কি, চা-পানে পর্যন্ত রুচি নেই, বলতে কি!

'সব মেয়েই আমার কাছে সমান'—য়্যাঁহ্? যে ভদ্রলোক অম্লানমুখে এজাতীয় বিবৃতি প্রকাশ করেন, করতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে বিপজ্জনক জীবন যাপন করছেন বুঝতে হবে। অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের সম্মুখেই রয়েছেন নিঃসন্দেহ! মনে করুন কোনোদিন নিজের বৌকে অপর কেউ বলে' তিনি ধারণা করলেন, অথবা তার চেয়েও মারাত্মক, অপর কারো পত্নীকে নিজের বলে' ভুল করে' বস্‌লেন? ভাবুন্ তো, কী অঘটন না ঘটতে পারে তারপর?

সত্যি কথা বললে, একটি মেয়ের সঙ্গে আরেকটি মেয়ের আশ্চর্য রকমের অনৈক্য! আকারে প্রকারে, আচারে প্রচারে, স্বরে আর ব্যঞ্জনায়, হাজারো রকমের খুঁটিনাটিতে এত বিস্ময়কর গরমিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়! তাজমহলের সঙ্গে ময়দানের রোলারের যতখানি মিল, দুটি মেয়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সাদৃশ্য নেই—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তাজমহল আর মানুষ-টানা রোলারে যে তফাৎ—ওই দুই বস্তুর গড়নে ও পেটনে, রঙে আর কারুকার্যে, ক্রিয়া এবং প্রতি-ক্রিয়ায় যে পার্থক্য—দৃশ্য এবং অনুভূতির সেই বৈসাদৃশ্যই স্ত্রীলোকপরম্পরা বিভিন্ন স্তরবিন্যাসে আরো বেশি বিচিত্র হয়ে প্রকট হয়ে বসুন্ধরার প্রত্যেক মেয়েকে আর সব মেয়ের থেকে স্বতন্ত্র করেছে বলে' আমার ধারণা।

তবে হ্যাঁ, এক বিষয়ে ওদের ঐক্য আছে বটে। পুরুষদের অপদার্থতা সম্বন্ধে ওরা একমত,—প্রায় সকলেই একবাক্য! এই একটি বিভাগেই ওদের সর্ববাদিনী-সম্মত মিলন দেখা যায়।

কিন্তু ঐ একটি জায়গায়। এ ছাড়া আর কোথাও সমস্ত নারীর সমত্ব আবিষ্কার করেছে বা সেই দুশ্চেষ্টায় কৃতকার্য হতে পেরেছে, আমার জানা শোনার মধ্যে এমন কাউকে তো দেখিনে। কেবল দুটি অভিব্যক্তি বাদে। শোনার মধ্যে ঐ বাণী-দাতা মহাত্মা—আর জানার মধ্যে, আমাদের শ্রীহর্ষ—যার-তত্ত্ব একটু আগে আমি হাড়ে হাড়ে জেনেছি। সতের

বছরের অজাতশ্মশ্রু শ্রীহর্ষও যে উক্ত ভূয়োদর্শী বিবৃতি-দায়কের সমান পাল্লার নায়ক হতে পারে তা কে জানত ?

বাড়ি ফিরে দোর-গোড়াতেই শ্রীহর্ষকে দেখলাম, কিন্তু শ্রীহৃষ্ট দেখলাম না। "কফি হাউসে কাল ঢুকতে দেখেছি তোমায় !" বল্ল সে—প্রথম দর্শনেই।

"দেখেছ তো কি ? কফি হাউসে কি কেউ যায় না ?"

"বলি, কাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুনি ?"

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ছোটরা বয়স্কদের সামনে এসে এহেন প্রশ্ন উত্থাপন করতে সাহসী হোতোনা। কদাপি না। এই কথাটাই আমার জবাবে স্পষ্ট ভাষায় ওকে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু এ'কথার বিশেষ কিছু ফল দেখা গেল না। শ্রীহর্ষ মোটেই দমিত না হয়ে বল্‌ল, "একটি মেয়েকে নিয়ে ঢুক্‌তে দেখেছি তোমায়, বলে' দেব দিদিকে।"

"যাকে নিয়ে গেছলাম তাকেও তোমার দিদির মতন মনে করতে বাধা নেই। তোমার চেয়ে বয়সে বড়ই হবে। পরের দিদিকে ভিন্ন চোখে দেখতে নেই। সবার দিদিকে নিজের দিদি বলে' ভাবতে শেখো শ্রীহর্ষ !"

"হ্যাঁ তাই বুঝি !" আমার উপদেশামৃত পান করেও ও নির্বিষ হয় না।

"তোমার দিদির থেকে সেই মেয়েটি কোথায় কোনখানে আলাদা বুঝিয়ে দাও তো আমায় !" আমি বলি।

"আমার দিদি তো নয় সে।" শ্রীহর্ষ জানায়ঃ "তাছাড়া দিদির চেয়ে দেখতে ঢের ভালো !"

সর্বনাশ! তাহলেই সেরেছে! কল্পনা যেরূপ পরশ্রী-কাতর, অপর কোনো মেয়ের সৌন্দর্য সে দুচোখে দেখতে পারে না; তারপরে সেই দুঃসহ দৃশ্য যদি তাকে শ্রীহর্ষের চোখে দেখতে হয় তাহলে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত তার জ্বালা আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবার কথা।

"দিদিকে আমি বলে' দেব।" শ্রীহর্ষের সেই এক গোঁ। ভারী গোঁয়ার শ্রীহর্ষ। কিন্তু এটা কি শুধুই ওর গোঁয়ার্তুমি? নিছক—নিষ্কাম? না, গত সপ্তাহে ওর সিনেমা দেখার দর্শনী দিতে ভুলে যাওয়ার জন্যেই এই প্রতিশোধ-লালসা?

"বেশ, এর পর ফের যেদিন যাবো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমার দিদির সাথেই নিয়ে যাব বলছি। এবং যতো পারো আইস্‌ক্রীম্ খেয়ো।"

"আইস্‌ক্রীম্ আমার চাইনে,—আমি যা চাই তা যদি আমাকে এনে দিতে পারো তাহলেই দিদিকে আমি বলব না কক্ষনো।"

শ্রীহর্ষের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাকে মধুর সম্বন্ধই বলা চল্‌ত—কিন্তু দিনকে দিন যেভাবে ভয় দেখিয়ে এবং দিদি দেখিয়ে আদায় করার ওর উৎসাহ দেখছি তাতে আমাদের সম্বন্ধের এই মাধুর্য বেশিদিন বজায় থাকলে হয়। অচিরকালেই আমাদের মধ্যে মিষ্টতার আর লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে মনে হয় না।

"কী তোমার চাই শুনি?" আমার নিরুৎসুক জিজ্ঞাসা।

"একটি মেয়ের ফোটো তুলে দিতে হবে আমায়।" শ্রীহর্ষ বলে ঃ "তুলে দেবে বলো আগে?"

"বেশত, এইতো আমার ক্যামেরা। নাও। নিজেই তুমি তোলো গিয়ে। যটা খুশি, স্বচ্ছন্দে।" এই বলে' গললগ্নীকৃত আমার ক্যামেরাকে ওর হাতে তুলে দিই।

"উঁহু—আমি না—আমি—আমার সাহস হয় না।" দুঃসাহসের কল্পনাতেই ও শিউরে ওঠে। ওর সহর্ষতা লোপ পায়।

"তা—তার কি—সেই মেয়েটির কি তোলানো কোনো ফোটো নেই? চেয়ে নিলেই তো হয় একটা।" অগত্যা অন্য উপদেশ দিতে হয়।

"তা—চেয়ে নিলে হোতো। কিন্তু কি বলে' চাইবো? আমি যে ওকে ভালোবেসেছি একথা মেয়েটি একেবারেই জানে না। টের পায়নি এখনো।"

"তুমি এত করে' তাকে জানাবার চেষ্টা করা সত্বেও—? মানে, কাউকে কিছু জানাবার শক্তি তোমার অসাধারণ বলেই আমার ধারণা।" স্বভাবতই আমাকে অবাক হতে হয়।

"হ্যাঁ, কিছুতেই ওকে বোঝানো যাচ্ছে না।" ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে সে জানায় ঃ "আমি ওর ফুলগাছ থেকে ফুল পেড়েছি, তার থেকে ওকে উপহার দিয়েছি পর্যন্ত—কিন্তু তবুও না। আমি যে ওকে ভালোবাসতে পারি এ যেন ওর আন্দাজের বাইরে!"

"বটে বটে ?" এবার আমার একটু অনুকম্পাই জাগে ওর ওপর ঃ "তা—মেয়েটি কে ?"

"এই রাস্তার মোড়ের সেই লন্-ওলা বাড়িটা—"

"বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। মিস্ আইভি, তাই না ?"

বিষণ্ণ ভাবে শ্রীহর্ষ ঘাড় নাড়ে। ওর এখন সেই বয়েস, যে বয়সে যে মেয়েই ওর চোখের সামনে পড়বে সেই ওর মনের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে, গট্-গট্ করে' সটান—ওর নিজের চোখই এখন অন্য মেয়ের হাতের সিঁধকাটি। কিন্তু এহেন শ্রীহর্ষও যে ওর চেয়ে বয়সে সাত বছরের বড়ো একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে এমন বিস্ময়কর কীর্তি-স্থাপনা করবে একথা আমি —আমিও ভাবতে পারিনি।

"এটি তোমার ক'নম্বরের মানসী, শ্রীহর্ষ ?" এই আমি শুধু জান্‌তে চাই।

"এই আমার একমাত্র। এর আগে আর যতো মেয়েকে ভালোবেসেছি তারা কেউ না! এত ভালো আর—আর কাউকেই আমি বাসিনি—!" এই বলে শ্রীহর্ষ আড়াই হাত এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো ঃ "একে না পেলে আমার জীবন-যৌবন সব ব্যর্থ।"

অগত্যা, ক্যামেরা নিয়ে বেরুতে হোলো আমায়।

কুমারী আইভি সেন তখন লনেই বেড়াচ্ছিলেন। আমি ক্যামেরা হাতে তটস্থ হতেই তিনি দাঁড়ালেন।

"দেখুন যদি কিছু না মনে করেন—আস্পর্ধা বলে' না গণ্য করেন যদি—তাহলে একটি নিবেদন আছে। 'বাঙালী মেয়ের শারীরিক সুষমা' বলে' সাময়িকপত্রের জন্য আমি যে-প্রবন্ধটা লিখছি তার সাহায্যকল্পে আপনার একটি ফোটো যদি দয়া করে' আমায় তুলতে দ্যান্—"

"বেশ তো, তার জন্যে এত কিন্তু কিন্তু কিসের!" আহ্লাদে গদগদ হয়ে বল্লেন শ্রীমতী আইভি,—কিন্তু বলেই কোথায় যেন খচ্ করে' তাঁর এক খট্‌কা লাগ্‌ল: "সে তো বেশ সুখের কথাই, কিন্তু আমিই আপনার প্রবন্ধের সেই আদর্শ বঙ্গনারী কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার চেয়ে উপযুক্ত কেউ হলেই কি ভালো হোতো না? অধিকতর রূপগুণবতী যোগ্যতর কেউ—এই ধরুন, যেমন আমাদের সুষমাময়ী শ্রীমতী যমুনা?"

"বড্ড রোগা।" আমি সুকৌশলে কথাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি—যমুনাকে আইভি দু' চোখে দেখতে পারে না—আমার জানা। "যেমনটি আমি খুঁজ্‌ছি ঠিক তেমনটি নয়।" সখেদে জানাই।

এর পর আইভির প্রতিবাদ করার কিছু থাকে না। সহাস্য আননেই আমার ক্যামেরার সামনে আত্মসমর্পন করে।

ফোটো তোলা সমাধা হলে, কথাচ্ছলে, হাল্‌কা সুরে আমি জানিয়ে দিই: "অবশ্যি, মিস্ সেন্, একটা কথা! এই

প্রবন্ধ কবে যে কাগজে বেরুবে বলা কঠিন। আগামী মাসেও

বেরুতে পারে, আবার কয়েক মাস লাগাও বিচিত্র নয়। কিছুই বলা যায় না—সম্পাদকদের মর্জি, জানেন তো ?”

"হ্যাঁ, সে তো বটেই!" জানা না থাক্‌লেও (কেননা আইভি লেখিকা নন্) আমার কথায় সায় দিতে তাঁর আটকায় না।

নিজের কীর্তি-কলাপে বিমুগ্ধ হয়ে প্রসন্ন চিত্তে আমি ফিরে এলাম—। ফোটোটা খুব ভাল ওঠেনি—আমার হাতের কাজ তো। সন্দেশ ছাড়া আর কিছুই এ হাতে ভালো ওঠে না।—কিন্তু তাহলেও মেয়েটিকে চেনবার পক্ষে—একজন প্রেমিকের নজরের পথ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম হবার পক্ষে যথেষ্টই! নেগেটিভকে ডেভেলপ্ করে' প্রিন্ট-ওয়াশে লেগেছি, এমন সময়ে কল্পনা ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

"আইভিদের বাড়ি যেতে দেখলাম যে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"জরুরি কাজ ছিলএকটা—"

"জরুরি কাজ! কী এমন জরুরি কাজ?"

"তেমন কিছু না। এমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।" বল্‌তে বল্‌তে পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো। "দাঁড়াও আস্‌ছি," বলে টেলিফোনে কর্ণপাত করতে গেলাম।

টেলিফোন-কর্ম সেরে ফিরে এসে দেখলাম, কল্পনা একদৃষ্টে সেই ফোটোর দিকে তাকিয়ে। "আইভির ফোটো, এই—এই তোমার জরুরি কাজ?"

সত্য কথা বলাই এখানে সমীচীন—সমীচীন আর নিরাপদ, আমার মনে হোলো। সত্যমেব জয়তে—সত্যেরই জয় হোক্!

বল্লাম আমি : "আর বলো কেন? তোমার ভাইয়ের ফরমাস! শ্রীহর্ষের জন্যেই। ও-ই তুলতে বলেছিল। বেচারা প্রেমে পড়েচে এর। আইভিই ওর মানসীর সর্বশেষ সংস্করণ।"

কল্পনা তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল সাইক্লোনের আবেগ নিয়ে : "মোটেই না। হরশু বল্‌ছে ওর বর্তমান প্রিয়তমা হচ্ছে খ্যাল্‌না মিত্র।"

"খ্যাল্‌না? কে খ্যাল্‌না?" আমি আকাশ থেকে পড়ি—কে যেন আমার পায়ের তলা থেকে এক হ্যাঁচকায় মই কেড়ে নেয় : "এই নতুন খ্যাল্‌নাটি কে আবার? ও!—মনে পড়েছে, পাশের বাড়ি হপ্তা দুই হোলো নতুন ভাড়াটে যারা এসেছে তাদের সেই বারো তের বছরের ফুটফুটে মেয়েটি?"

শ্রীহর্ষের মত ছেলেও যে এমন চট করে' তার প্রিয়তমা পাল্‌টে ফেল্‌বে—এত অল্পক্ষণের মধ্যে মনের মতন নতুন মেয়ে খুঁজে পাবে—স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি! কিন্তু হায়, আইভি ও খ্যাল্‌না মানসীরূপে ওর কাছে সমান এবং পার্থক্যহীন হলেও কল্পনার কাছে মোটেই তা নয়।

"হ্যাঁ, সেই।" কল্পনার ওষ্ঠাধর আরো দৃঢ়তর ভাবে সুবিন্যস্ত দেখি।—"এবং আইভি সেন কোনো কালেই ছিল না।"

আমাকে নিজের কানে শুন্‌তে হয় একথা।

নবম পর্ব

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে—

"একটু চা না হলে তো বাঁচিনে!" কল্পনা দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা বক্তব্যটা বিশদ করল।

"চা-বিহনে মারা যাচ্ছি এমন কথা আমি বলতে পারিনে—" সত্যনিষ্ঠার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বলতে হয়: "তবে এক কাপ্ পেলে এখন মন্দ হোতো না নেহাৎ!"

"চায়ের একটা দোকান কাছাকাছি আছে কোথাও নিশ্চয়।"

"আমারও তাই ধারণা। চায়ের গন্ধ পাচ্ছি যেন! মিনিট খানেকের মধ্যেই কোনো চায়ের আড্ডার ওপরে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে পারি মনে হচ্ছে!"

কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়, অগুনতি মিনিট্, এবং হোঁচট্ও বড়ো একটা কম খাইনে, কিন্তু কোনো চাখানার চৌকাঠে নয়! আমি হতাশ হয়ে পড়ি এবং কল্পনা গেঁয়ো লোকের বোকামি আর ব্যবসাবুদ্ধিহীনতার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত না করে' পারে না।

বাস্তবিক, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছি অথচ চায়ের

নামগন্ধ নেই। কেন, গাঁয়ে গাঁয়ে চায়ের দোকান খুললে কী ক্ষতি ছিল? ফলাও কারবারে দু পয়সা উপায় হোতো বইতো না! এই তো, আমরাই তো দু কাপ্ খেতাম। ডবল দামেই খেতে পারতাম। এমনকি, চারগুণ দাম দিতেও পেছপা ছিলাম না—চা-র এম্‌নি গুণ!

কিন্তু এই গেঁয়ো লোকগুলো—একালে বাস করেও সেকেলে—সেসব কিছু বোঝে কি? যাতে দু পয়সা সাশ্রয়, নগদা-নগদি আম্‌দানি, তাতেই ওরা নারাজ!

"নাঃ, এখানকার কারু দূরদৃষ্টি নেই! কেন যে লোক মরতে আসে এখানে? বেড়াবার কি আর—"

কথাটা কল্পনাকে কটাক্ষ করেই বলা। পল্লী অঞ্চলে, পল্লী মায়ের আঁচলে হাওয়া খাবার সখ ওরই উথ্‌লে উঠেছিল হঠাৎ। এবং বলতে কি, যে-আমি এমন কলকাতাসক্ত, যাকে কলকাতার বাইরে টানা ভারী শক্ত ব্যাপার, প্রাণ গেলেও পাড়াগাঁর দিকে পা বাড়াইনে-সেই-আমাকে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে য়াদ্দূরে।

"—আর জায়গা পায় না?" বাক্যটাকে উপসংহারে নিয়ে আসি। এবং বলতে বলতে, পাড়াগাঁ-সুলভ—আরেক নম্বরের দূরদৃষ্টিহীনতা—পথভ্রষ্ট এক গাদা গোবরের ওপর পদক্ষেপ করে' বসি। ঠিক বসিনি—তবে আরেকটু হলেই বসে পড়তে হোতো, চাইকি ধরাশায়ী হওয়াও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু হাতের

কাছাকাছি কল্পনাকে পেয়ে—পেয়ে গিয়ে, তক্ষুনি তাকে পাকড়ে, নড়বোড় করে’ কোনোরকমে দাঁড়িয়ে গেছি।

“তোমার যে বাপু অদূরদৃষ্টিও নেই!” বিরস-বদনে কল্পনা বলে। স্বামীর আশ্রয়স্থল হয়েও সে সুখী নয়। তার ব্লাউজের একটা ধার নাকি ফ্যাঁ—স্ করে’ গেছে!

ব্লাউজ উদ্ভিন্ন হওয়ার দুঃখ আমার মনে স্থান পায় না। আমার আত্মরক্ষাতেই আমি খুশি। তাছাড়া, ভেবে দেখলে, কে কার? ব্লাউজ তো আমার নয়! এবং ব্লাউজ ইত্যাদি বিসর্জন দিয়েও স্বামীরত্নদের যদি অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানো যায় (সাধ্বীদের অসাধ্যি কী আছে?) তা কি স্ত্রীজাতির কর্তব্য না?

“বা রে! তুমি কি বলতে চাও যে আমি ইচ্ছে করে’ পড়তে গেছি? মানে, ঐ গোবরটার সঙ্গে চক্রান্ত করে’—?” ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বলি: “এই কথা তুমি বলতে চাও?”

“যাও! এদিকে চায়ের তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে।—তোমার ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না!”

“বাস্! আমি তো নেমেই চায়ের কথা তুলেছি। রেলোয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকতেই যাচ্ছিলাম—তুমিই বাধা দিলে!”

“আমাদের আগে আগে রেস্তরাঁয় সেই মেয়েগুলো ঢুকলো না? মনে নেই তোমার?”

“হ্যাঁ, সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়েরা? তাতে কী?”

"কী সব খাটো খাটো ফ্রক্-পরা তাদের—দেখেছিলে তো?"

"দেখেছিলাম।"

"তুমি যে দেখেছিলে সেটা আমিও দেখেছি। লক্ষ্য করতে আমার দেরি হয়নি।—আর সেই কারণেই ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না আমরা স্থির করলাম।"

আমরা? আহা! কল্পনার এই স্ব-গৌরবে বহুবচন—আমার ন্যায় নেহাৎ আ-স্বামীর পক্ষে এর জবাব আর কী আছে? তবুও আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌তে যাই: "কিন্তু ওরা তো বাঙালী নয়? মেম তো?"

"কিন্তু তাহলেও—তবুও তো অসময়ে চায়ের পিপাসা জেগে উঠতে তোমার কোনো বাধা হয়নি!"

"তোমার ভারী সন্দিগ্ধ মন! আমার বিশ্বাস, দার্জিলিঙে গেলে তুমি আমাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেও চোখ মেলে চাইতে দেবে না! আমাকে দেখছি সব সময়েই এভারেস্টের দিকে হাঁ করে' তাকিয়ে থাকতে হবে।"

বলার সাথে সাথে, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, (দার্জিলিঙে না গিয়েই) এভারেস্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি। আমার চিরতমার আগাপাশতলা বারেক পর্যবেক্ষণ করে' নিই—এমনকি, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ (সম্প্রতি ঈষৎ কুজ্ঝটিকামুক্ত) অব্দি বাদ যায় না! আগার দিক থেকেই আগাই—গোড়ায়।

"ইয়ার্কি কোরো না, যাও!" কল্পনা রাগ করে।

"ইয়ার্কি হোলো কোনখানে? ভেবে দেখলে তুমিই তো আমার, একাধারে, ইভ্ এবং রেস্ট্‌,—আর দ্বিধামুক্ত হলেই—এক কথায় ঐ। ব্যাকরণমতে দাঁড়ায় এভারের সুপার্‌লেটিভ। তাই নও কি? সাদা বাংলায় যাকে চিরন্তনী বলে গো!"

কল্পনা কোনো জবাব ছায় না। কথাটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে হয়ত বা।

"অবশ্যি কবিতা করেও বলা যায় কথাটা। সাদা বাংলাতেই আজকাল কবিতা লেখা হচ্ছে কিনা!" আমি দৃষ্টান্তের দ্বারা আরো প্রাঞ্জল করি: "সুধীন দত্তের লেখা পড়েছো তো? পড়োনি?"

"খুব হয়েছে! আর ব্যাখ্যানায় কাজ নেই! এখন কোথায় চাখানা আছে একটু দয়া করে' দেখবেন মশাই?"

এভারেস্টের উচ্চতম চূড়া থেকে এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে বাক্যস্ফূর্তি কেন, সব ফুর্তিই লোপ যায়! আমিও আর উচ্চবাচ্য না করে' চুপটি করে' চলতে থাকি। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গোবরদের সন্তর্পণে বাঁচিয়ে, ছোটখাট খানাখন্দ, উঁচু-নীচু নীরবে অতিক্রম করে' চলি।

একটু পরে কল্পনাই নিজের থেকে পাড়ে: "তখন আমি এইজন্যেই বলেছিলাম যে টিফিন ক্যারিয়্যার্ সাথে নিই! তুমিই তো না করলে। আনতে দিলে না আমায়।"

আমিও না বলে' পারি না: "যত দোষ নন্দ ঘোষ!"

এক বাক্যে, ঐ একটি গাত্র প্রবচনে, আমাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করি—আমার আর নন্দ ঘোষের।

এবার ও গম্ভীর হয়ে যায়। বহুক্ষণ গুম্—কোনো কথাবার্তা নেই। আমাকে ব্যস্ত হতে হয় অগত্যা। আমার কিরকম যে স্বভাব—অপর কেউ গুম্ হলেই আমি যেন খুন্ হয়ে যাই। কোথায় আমার খুন্‌সুটি লাগে, বুকের মধ্যে গুম্‌রে ওঠে। ডিজিটালিস্ খেয়ে, এমন কি, গীতার সেই মারাত্মক শ্লোক আউড়েও কোনো ফল হয় না—কিছুতেই এই ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বলং কাটিয়ে উঠতে পারি না দেখা গেছে। মার্জনা-প্রার্থনার সুরে, মার্জিত স্বরে অনুতাপের আর্জি পেশ করি ঃ

"খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে কী বড়লোকের অট্টালিকায় আর কী ছোটলোকের হট্টমন্দিরে—রাজপ্রাসাদেই কী আর পর্ণকুটীরেই বা কী, বাংলার ঘরে ঘরে ভারতীয় চা আজকাল সমাদৃত হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়—অন্ততঃ ঠিক ততটা নয়।"

"টিফিন্ ক্যারিয়ারটা আনতে দিতে কী হয়েছিল?" কল্পনার সেই এক কথা—প্রাচীন পরিকল্পনা!

"থার্মোফ্লাস্‌কে চাও আনা যেত! এখন তাহলে যেখানে হয় বসে' পড়ে' মজা করে' পিক্‌নিক্ করা যেত কেমন!"

"আনতে দিতে আর আপত্তি কী ছিল, কেবল বইতে তোমার কষ্ট হোতো বই তো না—তাইতো বারণ করলুম।

মানে—মানে আমারই হাত ব্যথা হয়ে যেত কি না শেষটায়—" কল্পনার বহন-নৈপুণ্যে আমি অতীব নাস্তিক্যবাদী।

টিফিন-ক্যারিয়ারের প্রস্তাবটা একধারে যেমন মুখরোচক, দূরদৃষ্টি আর বিচক্ষণতা-সহকারে চিন্তা করে দেখলে, অপরদিকে তেমনিই ঘর্মাক্তকর—দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে এই মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ, পা বাড়াবার আগেই আমি পরিষ্কার দেখেছিলাম, কল্পনার কাছে এই অপরাধ এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

"তুমি ভারী স্বার্থপর!" ও বলে: "নিজের হাত পার ওপর এত দরদ তোমার?"

"তা স্বার্থপর আমি একটু বইকি!" ভূতপূর্ব আমার সেই ভবিষ্যৎ-দর্শন এবার আরো একটু স্পষ্ট করি: "ভেবে দেখলাম, এও তো হতে পারে, তুমি নিজেই অচল হয়ে পড়লে! হাঁটাহাঁটির বালাই তো নেই আমাদের! তখন এক হাতে টিফিন্ ক্যারিয়ার্ আরেক হাতে তুমি—কোন্‌টা সাম্‌লাই? আর, গ্রাম্য দৃষ্টিতেও সেটা খুব সুদৃশ্য নয়! এমনিতে হয়ত একটা বোঝা তত বেশি না—কিন্তু তার ওপরে শাকের আঁটি চাপালেই মাটি! ঐতিহাসিক উটের পিঠে চূড়ান্ত তৃণখণ্ডের মতোই দুঃসহ কাণ্ড! তা ছাড়া—তা ছাড়া—" বিষয়টা আমি আরো খোলসা করি: "দুটো বোঝা থাকলে হয়ত আমি দোনামোনায় পড়ে যেতাম। ওরকম অবস্থায় মানুষ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কাটাকেই বেছে নেয় কিনা!"

"জানি জানি, আর বল্‌তে হবে না।—" কল্পনা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: "তুমি টিফিন্ ক্যারিয়ার্‌টাই হাতে নিয়ে ট্যাং ট্যাং করে' বাড়ি ফিরে যেতে আমি খুব জানি।"

"মোটেই না।" আমি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়ি: "আমি তোমাকেই নিতাম। টিফিন্ ক্যারিয়ারের চেয়ে মাউণ্ট এভারেস্টই আমার কাছে বেশি হাল্‌কা মনে হোতো। তাছাড়া, পর্বতচূড়া বইবার ভাগ্য কজনের হয়? হলে কজন সে সুযোগ ছাড়তে পারে? পুরাকালে সেই একদা শ্রীমান্ হনুমান্ এই মোকা পেয়েছিলেন—গন্ধমাদন-বহনের সময়—কিন্তু তিনি—তিনিও যতই বোকা হন, হাতছাড়া করতে পারেননি।"

"হয়েছে হয়েছে, খুব হয়েছে! যেমন পুরাণ, তেম্‌নি ইতিহাস, সবই তোমার নখদর্পণে—টের পেয়েছি বেশ। এখন কোথায় গেলে একটু চা পাওয়া যায় তা যে কেন তোমার মাথায় আসছে না, তাতেই আমি ভারী অবাক্ হচ্ছি!"

"দাঁড়াও না! এক্ষুণি একজন সদাশয় অতিথি-বৎসল আদর্শ গ্রাম্য লোকের দেখা পেলুম বলে'! আমাদের দেখেই তিনিই আপ্যায়িত হয়ে অভ্যর্থনা করবেন—চা-তো খাওয়াবেনই, সেই সঙ্গে চিড়েমুড়কি—ঘোরো গোরুর খোড়ো দুধ—সমস্ত মিলিয়ে মিষ্টি একটা ফলারও বাদ যাবে না। শুনেচি পাড়াগাঁর ওরা নিরাশ্রয় বিদেশী লোক দেখলেই কোনো কথা শোনে না, ধরে বেঁধে খাইয়ে ছায়।"

"সেসব দিন গেছে!" কল্পনার হাহুতাশ শুনি: "এসব দৈত্য নহে তেমন!" দুঃখের চোটে, হেমচন্দ্র থেকে পঙ্কোদ্ধার করতেও সে বাকী রাখে না।

"আচ্ছা, এইবার কাউকে দেখতে পেলে জিগেস করব।" আমি বলি। মরিয়া হয়ে বলি।

"দেখতে পেলে তো!" কল্পনা বিশেষ সান্ত্বনা পায় না।

বাস্তবিক, এতক্ষণ ধরে' এতখানি পথ—এত গণ্ডা চষা এবং না-চষা মাঠ পার হয়ে এলাম, দু-একটা গণ্ডগ্রামও যে না পেরিয়েছি তা নয়, কিন্তু, বাক্যালাপ করবার মতো একটা মানুষ চোখে পড়ল না। যাও বা এক আধটা আমাদের সীমান্ত প্রদেশ ঘেঁষে গেছে, তাদের চাষা ভূষো ছাড়া কিছু বলা যায় না। চাষা কি আর চায়ের মর্ম জানে, চায়ের সোয়াদ্ চায়? তাকে চ্যয়ের কথা জিগেস করাও যা, আর কল্পনাকে চাষের কথা জিজ্ঞেস করাও তাই—একজাতীয় কল্পনাতীত ব্যাপার!

কিন্তু না, এর পর যে-ব্যক্তিই সামনে পড়বে, তা সে যেই হোক, তার কাছেই চায়ের কথা পাড়ব। এ-গাঁয়ের চাষাই হোক আর ভূষাই হোক, প্রথম কথাই চায়ের কথা এবং চায়ের ছাড়া অন্য কথা না।

এবং পড়লও একজন সাম্‌নে!

তিনটে চষা ক্ষেত আর সিকি মাইল সরু আলের রাস্তা ডিঙিয়ে গিয়ে তার দেখা মিলল। গাছের মগ্‌ডালে পা

ঝুলিয়ে বসেছিল লোকটা। গাছের ডালে বসে থাকাটাই বোধ হয় এধারকার চলতি ফ্যাসান্—ট্যাক্সোবিহীন আমোদ-প্রমোদ—এইরকম আমার ধারণা হয়েছে। যখনই কোনো গেঁয়ো লোকের প্রাণে ফূর্তির সঞ্চার হয়, সাধ হয় যে একটু হাওয়া খাই, অম্নি সে খুঁজে পেতে বিলাসিতার নামান্তর সহনশীল একটা গাছ আবিষ্কার করে' তার ডালে উঠে বসে' থাকে।

"এখানে চাখানা কোথায় বলতে পারো?" বৃক্ষাশ্রয়ী লোকটাকে আমি প্রশ্ন করি।

"ও নামে কেউ এখানে থাকে না।" পা দোলাতে দোলাতে সে জানায়। এবং তার কাছ থেকে কিছুতেই এর বেশি আর কিছু বার করা যায় না। আমরা তাকে গাছের ডালে পরিত্যাগ করে' আবার আমাদের ভূপর্যটনে বেরিয়ে পড়ি।

এর পরেই একটি তরুণী মহিলার সহিত আমাদের ধাক্কা লাগলো। মেয়েটি রাস্তার ওপরে বসে' ধূলো-মাটি জমিয়ে বালির ঘর রচনায় ব্যস্ত ছিল—কিম্বা এমনও হতে পারে, মাটির বানানে পুলিপিঠেই বানাচ্ছিল হয়ত বা।

"খুকি, শোনো তো? এখানে কোথায় চা পাওয়া যায়, জানো তুমি?" কল্পনাই জেরা করে।

"হ্যাঁ, জানি।" খুকি তার সপ্রতিভ ছোট্ট ঘাড়টি নেড়ে তক্ষুনি জানায়ঃ "আমাদের কেদার কাকু। কেদার কাকু চা ব্যাচে। কেদার কাকুর কাছে চলে যাও।"

"কোথায় থাকেন তিনি—সেই তোমাদের কেদার কাকু ?"

"এই গাঁয়ের শেষে—একেবারে শেষে গিয়ে।"

খুকির ব্যবহারে এবং বুদ্ধিমত্তায় চমংকৃত হই। তংক্ষণাৎ পকেট হাতড়ে চক্চকে দুটো আনি ওর দু' হাতে সঁপে দিই—সত্যি, পৃথিবীতে মেয়েরা না থাকলে—এই সব উপাদেয় প্রাণীরা আজো না টিঁকে থাকলে আমরা দাঁড়াতাম কোথায় ?

তারপর—চলেছি তো চলেইছি। যে-গাঁয়ের অবশেষে কেদার কাকুর উপনিবেশ সে গাঁ আর আসে না! এক মাইল হাঁটাহাঁটির পর আমি বলি: "এতখানি পথ পেরিয়ে এলাম, এতক্ষণে তো সে গ্রামে আমদের পৌঁছনো উচিত ছিল!"

"আমিও সেই কথাই ভাবছি।" কল্পনাও ভাবিত হয়েছে দেখা যায়: "আরো কতোদূরে গ্রামটা, এসো, ঐ বুড়ো লোকটাকে জিজ্ঞেস করে' জানা যাক্।"

আমাদের প্রশ্ন শুনে বুড়ো লোকটি আকাশ থেকে পড়লেন: "সে-গ্রাম তো তোমরা পেছনে ফেলে এসেছ বাপু! আন্‌মনা হয়ে ছাড়িয়ে এসেছ, তাই তোমাদের নজরে পড়েনি।"

বুড়ো লোকটি ভারী অবাক্ হয়ে যান—এবং আমরা—আমরা ততোধিক অবাক্ হই।

যাই হোক্, ফিরে চলি আবার—এবারে দুধারে খর-দৃষ্টি চালিয়ে যাই—দুজনেই কড়া নজর রাখি—যাতে ফের আবার কোনো গতিকে না ফস্‌কে যায় গ্রামখানা।

"আমার—আমার মনে হচ্ছে এইটাই বোধ হয় সেই গাঁ।" পথিমধ্যে থেমে পড়ে কল্পনা আপন সংশয় ব্যক্ত করে।

"এই যদি এদের গ্রাম হয়—" আমি বলি—"তাহলে পর্ণ কুটীর বল্‌তে এরা কী বোঝে তাই আমি জানতে চাই।"

আমরা কুটীর ওরফে সেই পল্লীগ্রামের দ্বারে গিয়ে ঘা মারি! দরজা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না—দরজার পাঠান্তর সেই নামমাত্র একটি যা ছিল তার ওপরে করাঘাত করতে হলে যথেষ্ট সাহসের দরকার—কেননা তার ফলে গ্রাম-চাপা পড়বার দস্তুরতই আশঙ্কা ছিল।

কল্পনার হারমোনিয়ম্ বাজিয়ে অভ্যেস্—সে-ই করাঘাতের দায়িত্ব নেয়। আমি গ্রামের আওতা থেকে সরে দাঁড়াই। কাপুরুষতার জন্যে না, দৈবাৎ যদি একজন গ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিমজ্জিত হয়—তাহলে তাকে সেই গ্রাম্য সমাধির কবল থেকে উদ্ধার করতে, নিতান্ত না পেরে উঠলে সেই গ্রামেই সমাধি দিয়ে ফিরতে আরেক জনের থাকা দরকার।

করাঘাতের একটু পরেই, গ্রাম ভেদ করে'—কিম্বা গ্রামান্তর থেকে—একটি বুড়ো লোক বেরিয়ে আসেন।

"কেদারবাবু এখানে থাকেন কোথায় বলতে পারেন দয়া করে?" দুজনেই যুগপৎ জিগেস করি: "কেদারবাবু ওরফে কেদারকাকু?"

"আমিই কেদার কাকু!"

"ও, আপনিই! যাক্, বাঁচিয়েছেন!" আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি: "গাঁয়ের ওরা বল্লে আপনি নাকি—মানে, আপনার নাকি—মানে—আপনার এখানে কিনা—"

কি করে' কোন্ ভাষায় যে চায়ের নেমন্তন্নটা অযাচিত ভাবে গ্রহণ করবার সুযোগ নেব ভেবে পাইনে।

"আপনি নাকি মনে করলে আমাদের একটু চা খাওয়াতে পারেন।" কল্পনার কিন্তু বলতে দেরি হয় না। প্রাণকাড়া একখানা হাসি হেসে চোখ ঘুরিয়ে কথাটা বলে' ছায়।

বাস্তবিক, অদ্ভুত এই মেয়েরা! ভাবলে চমক্ লাগে! সত্যি, পৃথিবীতে এরা না থাকলে অব্যর্থ আমরা গোল্লায় যেতাম।

কেদার কাকু নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে প্রকাশ করলেন: "ও—হ্যাঁ—তা ওরা ঠিকই বলেছে। কিন্তু চা আমার পুরণো খুব। তিন মাসের মধ্যে নতুন চা আসেনি—জেলায় আর যাওয়া হয়নি কিনা। কিন্তু চা তৈরির তো কোনো পাট আমার নেই। এম্নি ছটাক খানেক দিতে পারি—অল্পই রয়েছে। পাঁচ আনা লাগবে কিন্তু।"

"আপনি—আপনার এখানে চা তৈরি হয় না?" কল্পনার তারস্বর—হতাশার সুরে মেশানো।

"আমার এটা মুদীর দোকান—চায়ের আড্ডাখানা না!" কেদার কাকুর বিরক্তিম মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। পাঁচ আনা দিয়ে আধ-ছটাক চা-র একটা প্যাকেট বগল দাবাই করে

আমরা সেই গ্রামের দ্বারদেশে থেকে ছিটকে বেরুই। এবং আবার আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ি।

তারপর কত যে হাঁটি তার ইয়ত্তা হয় না—স্টেশনের দিকেই হাঁটবার চেষ্টা করি। কিন্তু বিভিন্ন পথিকের বিবৃতি থেকে যা টের পাই তার থেকে এহেন ইষ্টিশন-বহুল গ্রাম যে ভূপৃষ্ঠে আর দুটি নেই এই ধারণাই আমাদের হতে থাকে। এখান থেকে—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—যেদিকেই যাই না কেন একটা করে' ষ্টেশন পাবো—অচিরেই পেয়ে যাব—দশ বিশ মাইলের মধ্যেই পাওয়া যাবে তাও জানা গেল! এমনকি, সরাসরি নাকের বরাবর নৈঋৎ কোণ ধরে চলে গেলেও আর-একটা নাকি পেতে পারি, সেরকম সম্ভাবনাও রয়েছে। অতএব, কোনদিকে যাওয়া শ্রেয়ঃ হবে স্থির করতে না পেরে, অস্থির হয়ে আমরা দিগ্বিদিকে চলতে শুরু করে' দিলাম।

চলতে চলতে হঠাৎ এক অভাবনীয় দৃশ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত হোলো। পার্শ্ববর্তী ছোট্ট একটি আমবাগানের ছায়ায় দুটি ছেলে—স্কুল-পালানো বলেই সন্দেহ হয়—পিক্‌নিকের আয়োজনে মশগুল্ রয়েছে!

সুচারু একটি পিক্‌নিক্! স্টোভে খিচুরি চাপানো হয়েছিল—প্রায় শেষ হয়ে এল বলে'—ভুর্‌ভুরে তার সৌরভে চারদিক আমোদিত। পেঁয়াজ ছাড়ানো। ছোট বড় গোটাকতক

ডিম কাছাকাছিই গড়াগড়ি যাচ্ছে—খিচুরির সাথে অম্‌লেটের যোগাযোগ হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়।

ঘেসো জমির ওপর খবরের কাগজ বিছানো হয়েছে। তার ওপরে ঝক্‌ঝকে চিনেমাটির প্লেট্‌—খিচুরির আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সেজেগুজে বসে'!

"আহা!" আমার জিভে জল এসে যায়! চায়ের তেষ্টা তো ছিলই, তার ওপরে খিদেও পেয়েছিল বেশ!

'এক প্লেট্‌ খিচুরি পেলে মন্দ হোতো না!' এই কথাটা স্বগতোক্তির নেপথ্যেই রেখে দি।

"চায়ের কাপ্‌ও রয়েছে দেখেচো!" কল্পনা দেখিয়ে গ্যায়। তার মানে, চায়ের আয়োজনও হয়েচে ওদের—বলতে গিয়েও মুখ ফুটে বলতে পারে না ও—মনের মধ্যেই চেপে রাখে। ওর জিভের খবর বলতে পারি না, তবে ওই কথাটাই ওর মুখে চোখে উন্মুখর হয়ে—ভরপুর হয়ে উঠেচে দেখতে পাই।

খবরের কাগজের ওপরে আরো কি কি যেন ছিল—আচার, আমসত্ব, পাঁপড়, ছানার মণ্ডা, মাখন এবং আরো কি কি সব—পাশ দিয়ে যাবার সময়ে, ঝুঁকে পড়ে, খুঁটিয়ে দেখবার আমি চেষ্টা করি—দেখেই যতটা সুখ! কল্পনা আমাকে এক হ্যাঁচ্‌কা লাগায়ঃ "চলে এসো! ছিঃ! ওকি? হ্যাংলা ভাববে যে!"

অবশ্যি, দেখতে পায়নি। ছেলে দুটি খিচুরি নিয়েই মত্ত! তাহলেও, কল্পনাই ঠিক! পরের খিচুরি এবং ইত্যাদি—পরকীয়

যা কিছু, চেখে দেখার আশা নেই তা শুধু শুধু চোখে দেখে লাভ? সুধা দেখলে কি আর ক্ষুধা মেটে?

পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ করে' ফের আমরা রওনা দিই। কল্পনা আমাকে বকতে বকতে যায়: "তোমার ভারী পরের জিনিসে লোভ! বিচ্ছিরি! কেন, আমি—আমি তো একটুও লালায়িত হইনি।…" সুরুৎ করে' জিভের ঝোল টেনে নিয়ে সে জানিয়ে দেয়।

আমবাগানটা পেরুতে না পেরুতেই বিরাট এক চীৎকার এসে পৌঁছয়। আওয়াজটা আমাদের তাড়া করে' আসে। আমরা দাঁড়াই, সেই ছেলেদুটিই দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

"আপনাদের পিছু ডেকে বাধা দিলুম, কিছু মনে করবেন না।" ওদের একজন কিন্তু-কিন্তু হয়ে বলে: "দেখুন, আমরা ভারী মুস্কিলে পড়েছি—পিক্‌নিকের সমস্ত আনা হয়েছে, কেবল চায়ের প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছি। অথচ, সব কিছু হলেও, চা ছাড়া কি পিক্‌নিক্ জমে, বলুন তো?"

অপর ছেলেটি শুরু করে: "পাশের জেলা থেকে বেড়াতে এসেছি—এখানকার দোকান হাট কোথায় কিচ্ছু জানিনে। কোথায় গেলে চা কিন্‌তে পাওয়া যাবে, মুদীখানা কিম্বা মনোহারী দোকানটা কোন্ ধারে বলে' দেবেন দয়া করে'?"

"মুদীখানা এখান থেকে ঢের দূর। প্রায় একখানা গ্রাম জুড়েই একটা মুদীখানা।" আমি বলি: "কিন্তু তার দরকার কি,

আমাদের সঙ্গেই এক প্যাকেট চা আছে—ইচ্ছে করলে নিতে পারো—স্বচ্ছন্দেই।"

"দেখেছিস্!" একটি ছেলে জ্বল্‌জ্বলে চোখে আরেকটির দিকে তাকায়ঃ "একেই বলে বরাত—দেখলি তো! কী বলেছিলাম? ধন্যবাদ! আপনাদের যে কী বলে' ধন্যবাদ দেব বলতে পারি না! তা—তা এর—এর দাম কতো—?"

"ও—না না! সে তোমাদের দিতে হবে না!" আমি হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিই—প্রায় মাছি তাড়ানোর মতই।

এবং এর পর—এর পর আর ওদের কী করার ছিল? নিতান্তই যা ছিল তা না করে' উপায় ছিল না। এবং এর পর অনিবার্যরূপেই মিনিট দশেক বাদে সবাই আমরা সেই ভূপতিত খবরের কাগজকে ঘিরে, খিচুরির চার পাশে জমায়েৎ হলাম।

মাখম-মাখানো আলু-সঙ্কুল গন্ধ-ভুর্‌ভুরে গরম গরম সেই খিচুরি, অম্‌লেটের সাহায্যে কী ভোফাই যে লাগলো তা আর বলবার নয়! তার সাথে মাঝে মাঝে চাট্‌নি—পাঁপড়ের টুক্‌রো—আচারের টাক্‌রা—প্রভৃতিরা—আর অবশেষে, সব-শেষে চা, আহা,—বলাই বাহুল্য!

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পর কল্পনা বল্ল ঃ "বলতে গেলে হয়তো তুমি ছোটলোক বলবে! কিন্তু আমাদের চায়ের

বাকীটা, সেই প্যাকেটটা, সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল! প্রায় আধ-পোটাক চা—পাঁচ আনা দাম তো!"

সংসারে ফিরে এলে উচ্চ নজরও তুচ্ছ খবরে নেমে আসে। সংসার এম্‌নিই! তাছাড়া, তিল কুড়িয়েই তাল, বল্‌তে কি! এবং যে সব তিলোত্তমাকে সেই তাল সাম্‌লাতে হয় তাঁরাই জানেন!

পকেট থেকে বার করে বিনাবাক্যব্যয়ে চায়ের প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিই।

"কিন্তু এ—এতো—আমাদের কেনা চায়ের প্যাকেট নয়। ···একি?···য়্যাঁ?" ১/৩ বিস্মিত, ১/৩ বিমুগ্ধ, ১/৩ বিরূপ দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকায়॥

"এ ছাড়া—ভেবে ছ্যাখো—ওদের পিক্‌নিকে যোগ দেবার আর কোনো উপায় ছিল না। আর তুমি—তুমিও চা চা করে' যেমন চাতকের মত হয়ে উঠ্‌লে,—কি করব?" কৈফিয়তের সুরে আমি বলি: "আর তোমার জন্যে—বলো—কী না আমি করতে পারি?"

সহধর্মিণীর জন্যে লোকে সহনীয় অধর্ম তো করেই, করে' থাকেই, অসহনীয় ধর্মাচরণেও পেছ পা হয় না—আমি আর এমন কী বেশি করেছি? দস্যু রত্নাকরের খুন্‌সুরি থেকে শুরু করে' তাজমহলস্রষ্টার প্রিয়তমার কবর-ই রচনা—অহো! আগাগোড়া সব জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমার নিজের জাজ্জ্বল্যমান

উদাহরণে এসে পৌঁছব—জবাবদিহির এই সব প্যাঁচ মনে মনে ভাঁজছি, কল্পনা আমার চিন্তাশীলতায় বাধা দেয়ঃ "অবশ্যি, চায়ের জন্যে কী না করা যায়! তা ঠিক! কিন্তু তা বলে এতটা—এতদূর—" কূটনৈতিক ভাষায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে অবশেষে ও স্পষ্টবাদী হয়ে পড়েঃ "য়্যাঁ? শেষটায় চুরি-চামারিও তুমি বাদ দিলে না! ছি ছি!"

"ছাখো, আর যাই বলো চুরি বোলোনা!" ক্ষোভার্ত কণ্ঠে আমি বলিঃ "চামারি বলতে পারো ইচ্ছা করলে।...কিন্তু যারা দুবেলা চা মারে তাদের আর চামার হতে বাকী কি?"

"হাতসাফাইটা করলে কখন্ শুনি? অবাক্ লাগছে আমার!"

"সেই যখন ঝুঁকে পড়ে খবরের কাগজের ওপরে সমবেত খাদ্য-তালিকাদের দেখছিলাম, সেই সময় ওদের এই চায়ের প্যাকেটটাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে—প্রথম দর্শনেই—"

"যাও যাও, আর বলতে হবে না। ছি ছি!—" কল্পনা কানে আঙুল

দশম পর্ব
মাসি, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ

অভাবনীয় কিছু একটা যে ঘটেছে কল্পনার মুখ দেখেই টের পেলাম।

"ভাবো দিকি, কী বরাত!…" আমার গৃহপ্রবেশের আগেই সে তর্‌তর্‌ বেগে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সেই আবেগের মুখেই শুরু করেচে—"উঃ, কী জোর বরাত ভাবো একবার। কেষ্ট বাবুর গিন্নী এসেছিলেন!"

শুনেই আমি পুলকে শিউরে উঠব, এই রকম ওর প্রত্যাশা থাকলে বল্‌তে হবে ওকে আমি হতাশ করেছি। পরমানন্দে কিম্বা কম্পজ্বরে যে-ধরণের শিহরণের বিজ্ঞাপন বেরোয় চেষ্টা করেও তার ধার-কাছ ঘেঁষে যেতে পারলাম না। আমার কাঠ গলার থেকে বার হোলো: "কোন্‌ গিন্নী বল্‌লে?"

"কোন্‌ গিন্নী! তার মানে? কেষ্ট বাবুর কটা গিন্নী আবার?" কল্পনার কণ্ঠে বিস্ময় ধরে না।

"কোন্‌ কেষ্টবাবুর কথা বল্‌চ? আসলে কেষ্টবাবু যে কে—"

"আসলে আর নকলে—ক'জন কেষ্ট বাবু শুনি ?" কল্পনাও জানতে চায়।

"কি করে' বল্‌ব ? প্রত্যেক পাড়াতেই এক ডজন করে' কেষ্টবাবু আছেন। তাঁদের মোট সংখ্যা আমার জানা নেই, তাছাড়া, কেষ্টবাবুদের গিন্নীরা সর্বসাকুল্যে ষোড়শ সহস্র ছাপিয়ে গেলেও, এবং গোপিনী না হলেও, গোপনেই রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কোন্ জনা এসেছিলেন কি করে' জান্‌ব ?"

"ও, তুমি চেনোনা—তা, চিন্‌বেই বা কি করে' ? এ পাড়ার নন তো। শ্যামবাজারের বাসিন্দে—আমার সইয়ের পড়শী। কেষ্টবাবু সেখানে আমাদের পাড়ার মেসো, সেই সুবাদে আমরা ওঁকে কেষ্টমাসি বলি। আজ এধারে বেড়াতে এসেছিলেন কি না! আমাদের বাড়িও এলেন তাই—" কল্পনা আস্তে আস্তে ভাঙে ঃ "তুমিও বেরুলে আর উনিও এলেন।"

"তা, কেষ্টমাসির এবম্বিধ আকস্মিক আক্রমণের কারণ ?" দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলি ঃ "কেন তাঁর এই শুভ-পদার্পণ জানতে পারি কি ? অবশ্যি,ইনি কোনো মহিলা-সমিতির চাঁদা আদায়কারিণী হলে আমার বলার কিছু নেই।"

যদ্দূর আমার ধারণা, চাঁদের লোভে বা চাঁদার প্রলোভনেই মানুষ এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় হাত বাড়ায়। হাত বাড়িয়ে না কুলিয়ে উঠলে বাধ্য হয়েই পা বাড়াতে হয়। নাগালে না পেলে গালে পাওয়া যায় কি করে' ?

"চাঁদার কী বলছ? কিসের চাঁদা?" কল্পনা অবাক্ হয়।

"মানে, এই কল্‌টা কি কোনো ক্লাবের কল্? নিছক হার্টের কল্ হলে আমার বলবার কিছু নেই; ব্লাফ্ কল হলেও কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু আর কোনো কল্ হলে, স্পেড-ওয়ার্ক-জাতীয় কিছু হলে—"

"যাও যাও, আর ব্রিজের বিদ্যে জাহির করতে হবে না। খেলতে বসে' তো হেরে মরো খালি, আবার চোখ বড়ো করে' মুখ নাড়া হচ্ছে। না গো না, ক্লাব্-ডায়ামণ্ডের কিছু নয়, কেষ্ট বাবুদের গয়নার দোকানও না—জামা-কাপড়ের ব্যবসা।"

কাপড়-জামার ব্যবসা; তবু ভালো। আদায়ের ব্যাপার নয়, রক্ষা তবু। কিন্তু এই তবু রক্ষার মধ্যেও এক খট্‌কা লাগে, এই জামা-কাপড়ের ব্যাপারীরাই চোরা কারবারে জাহাজের খবরদারদেরও টেক্কা মারছেন এখন না? এই বস্ত্রকণ্ট্রোলের দিনে গিন্নী-কণ্ট্রোল্, বিশেষ করে' কেষ্ট-গিন্নীদের কণ্ট্রোলের কোনো ধারা আমার জানা নেই। এঁরা ভারতরক্ষা-বিধির বহির্ভূত বলেই আমার ধারণা।

"কি বল্লে? জামা-কাপড়ের কারবার—কী বল্লে?" আমি ককিয়ে উঠি: "কালো বাজারের কাণ্ড নয় তো? অগ্নিমূল্যে তুমি কিছু কিনেছ নাকি? ইয়াঁ?..." আমার প্রশ্নের অনুস্বরটা আর্তনাদের মত শোনায়!

"কী যে বলো! কেষ্টবাবুদের জামা-কাপড়ের ব্যবসা

বটে—কিন্তু বেচবার নয়, কেনবার। আমাদের কেষ্টমাসি বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরনো কাপড়-জামা সব কেনেন।"

"ওঃ, তাই বলো!"—এতক্ষণে ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়েঃ "তা বলতে হয়! তা কখানা কলাইকরা বাটি হোলো?" জানতে আমার আগ্রহই জাগে, বলতে কি!—"চায়ের কাপ্-টাপ্ পেয়ছো কিছু?"

"এ কি তোমার সেই যারা ছেঁড়া কাপড়ের বদ্‌লি এনামেলের বাসন দেয় তাদের পেয়েছ?" কল্পনা ঠোঁট ওলটায়ঃ "সেই হাঘরেদের? বলছি না যে কেষ্টবাবুর গিন্নী?"

"ও হ্যাঁ—কেষ্টবাবুর গিন্নী! তাও তো বটে!" উক্ত গিন্নীর কেষ্টবাবুত্ব আমি ভুলতে বসেছিলাম! সলজ্জ বোধ করে' বলি—"তাহলে—তাহলে কি উনি—বদ্‌লি কিছু না দিয়েই যত ছেঁড়া কাপড়-জামা—?" 'নিয়ে সট্‌কেছেন' বলতে আমার পাপ-মুখে আট্‌কায়। কতদূর হঠকারিতা কেষ্টবাবুর গৃহিণী-সুলভ হতে পারে আমার কল্পনায় আসে না।

"মোটেই ছেঁড়া কাপড় নয় মশাই—মোটেই তা নয়। এই যত অল্প-পুরনো প্রায়-নতুন কাপড় জামা শাড়ি ব্লাউজ শাল দোশালাই ওঁরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনে থাকেন—সামান্য খুঁৎ হয়েছে এমন সব জামা কাপড়! গোবরগণেশের মাথায় ঢুক্‌লো এবার?"

"তাই না কি?" আমি মাথা চুলকাই। বিষয়টা মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করি।

"বরাত জোর বলতে হবে, তা না হলে কখনো ওঁর পায়ের ধূলো পড়ে ? আর ঠিক এমন সময়ে—পূজোর এই মুখটাতেই ?"

একজন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড-ক্রেত্রী, এবং নিশ্চয়ই থার্ডহ্যাণ্ড-বিক্রয়িত্রী, এহেন পূজোর সম্মুখে আমাদের যে কী উপকারিতায় এসে গেলেন তার রহস্যভেদে অপারগ হয়ে, আমার দুই চোখ দুটি প্রশ্নপত্র হয়ে ওঠে। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে আমি ওর দিকে তাকাই। তাকালেই উত্তরের কিছুটা অবশ্যি মেলে, পাকা গিন্নীর সব দুর্লক্ষণ স্তরে স্তরে ওর মুখপটে সাজানো, নজরে না পড়ে পারে না ; তবুও ঐ গিন্নীপণা, গিন্নীতে গিন্নীতে ধূলপরিমাণ হয়ে কোন্ পরিণামে পৌঁছেচে না জেনে স্বস্তি পাইনে।

"কিন্তু আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে কেষ্টবাবুর গিন্নী আমাদের কী পরোপকারে লাগতে পারেন।—"

"বাঃ, এই পূজোর বন্ধে আমরা পুরী যাচ্ছিনে ? মনে নেই তোমার ? এখন প্রত্যেকটি পয়সা আমাদের সাশ্রয় করা দরকার, তুমি নিজেই তো বলেচ,—বলোনি কি ? আর কেষ্টবাবুর গিন্নী যখন অযাচিত এসে আমাদের পুরী যাওয়ার যাবতীয় খরর নিজের স্কন্ধে নিতে চাইলেন—নিজেই বইতে রাজি হলেন, তখন কি না তুমি মুখ হাঁড়ি করে' যা তা বক্তে শুরু করলে !"

"ও তাই না কি !" মুখের হাঁড়িটাকে এবার আমি সরালাম : "পুরী অভিযানের কথা আমার মনেই ছিল না আদপে !...হ্যাঁ, তাই তো।...তা, বাইরে কোথাও যেতে হলে পয়সার দরকার

তো বটেই! তা কেষ্টবাবুর গিন্নী—মানে, আমাদের কেষ্ট মাসির দ্বারা সেদিক দিয়ে কি কিছু সুবিধে হোলো?…"

"সেদিকটা ভেবেই তো আমি…আর বলব কি, কেষ্টমাসির পার্স নোটের তাড়ায় যেন ফেটে পড়ছে। তাই তো আর কোনোদিক না তাকিয়ে তক্ষুনি তাকে বধ করে' ফেল্লাম।"

"য়্যাঁ, বলো কী?" আমি চমকে উঠি, কল্পনার কীর্তির কথা ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতে থাকে—"ব—ব—ব—বলো কি—একেবারেব—ব—বধ করলে?…"

কল্পনা শুধু বলে: "য়্যাঁ?—"

"খুব খারাপ করেচো। যৎপরোনাস্তি অন্যায় হয়েচে।"

আস্তে আস্তে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠি। নিজের ফাঁসি-কাঠ থেকে দড়ি ছিঁড়ে পড়লেও সামলে ওঠে মানুষ,—সামলে উঠতেই হয়। এমন কি, সামলে উঠে ফের সেই ফাঁসি-কাঠেই গিয়ে উঠতে পারে, হয়ত বা হাসিমুখেই—আর এ-তো শুধু কেষ্টবাবুর গিন্নীবিয়োগ, আমার কিছুই না! ভেবেছিলাম মূর্চ্ছা যাব, কিন্তু না, সামান্য মূর্চ্ছনার ওপর দিয়েই কেটে গেল।

"ছিঃ, ভালো কাজ করোনি।" বলি আমি: "তোমার উপযুক্ত কাজ হয়নি।"

আমার সহধর্মিণী কি না, সামান্য টাকার লালসায়, নাহয় পার্স-ভর্তি অসামান্য টাকাই হোলো,—শেষটায় এত দূর নামবে, —লোভের তাড়নায় এতটা পরধন-লোলুপ হবে আমি

ভাবতেই পারি না। আমার অর্ধাঙ্গ—শ্রেষ্ঠতর অর্ধেক—যদি এক চোটে এতখানি অগ্রসর হতে পারে তাহলে এই দৃষ্টান্তের প্ররোচনায় বাকী অর্ধাঙ্গ—আমার নিকৃষ্টতর আধখানা, স্বয়ং শর্মা, কতোটা পরার্থপর হয়ে আরো কতো বেশি দূর না এগিয়ে যেতে পারে আমি তার কিলোমিটার কষবার চেষ্টা করি।

"ইস্! এ কাজের ফল কদ্দূর গড়াবে কে জানে!" ভেবে আমি কূল পাই না। আমি গিয়ে খোদ্ কেষ্টবাবুকে হত্যা করচি, এই দৃশ্য আমার চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

"তুমি কী বল্‌চো?" কল্পনা থতমত খায়।

"বল্‌ব আর কি, বলবার কি কিছু রেখেচ? সব তো সেরে সুরে বসে আছো।" আমি আক্ষেপ করি: "করবারও কিছু বাকী নেই।"

আগাগোড়া সবটাই আমার বিচ্ছিরি লাগে, যতই ভাবি ততই আরো বিতিকিচ্ছিরি হয়। উনি করলেন খুন, আর ম্যাও ধরতে আমি—এত হাঙ্গাম্ পোহায় কে এখন? কেষ্টবাবুর গিন্নীর এমন অযথা কেষ্টপ্রাপ্তির—এরূপ অকালে আর অস্থানে—নিজের কেষ্টকে ফেলে অন্য কেষ্টলাভের অকস্মাৎ এমন কি প্রয়োজন পড়েছিল, য়্যাঁ? মন-খারাপ-করা অমন-মোটা পার্স নিয়ে, আমার অবর্তমানে, আমাদের বাড়ি, আমার এই খাণ্ডাখর্পর-ধারিণীর কাছে না এলেই কি তাঁর চলতো না? অন্ততঃ, আজকেই না এলে এমন কী দারুণ হানি হোতো তাঁর?

"মাথা খারাপ হোলো না কি তোমার ?" কল্পনা বলে। বলে' আরো বেশি আমার মাথা খারাপ করে' দেয়।

"যাক্‌গে, যেতে দাও।" মরীয়া হয়ে মাথা ঠিক রাখবার চেষ্টা করি—"বিদায় করেচ যারে নয়নজলে—সে যাক্‌। তাকে আর ফেরানো যাবে না। রুষ সার্জনরাও এদেশে নেই, রুষ্ট হয়ে কী করব ? মরা বাঁচাতে শুধু তারাই পারে।···যাক্‌গে, ···এখন, সেই লাশটা কোথায় ? কোথায় রেখেচ লুকিয়ে ? আমার চৌকির তলায় না তো ?"

ভাবতেই আমি শিউরে উঠি, ওর তলায় রেখে থাকলেই হয়েচে! তাহলে আর ওর ওপরে এ জীবনে আমি ঘুমুতে পারব না, যা আমার ভূতের ভয়! জন্মের মত চৌকিদারি গেল আমার। "চৌকির তলায় রাখোনি তো ভুল করে' ? আর—আর সেই পার্স্‌টা কি করলে ?—"

আমার অধমাঙ্গের পার্সোনালিটি ফিরে এসে উত্তমাঙ্গের পার্শ্ববর্তী হতে চায়। য়্যাতো বখেরার পরে বখরায় বাদ পড়াটা কাজের কথা বলে তার মনে হয় না।

"আমি আবার কী করব ? যাঁর পার্স্‌ তাঁর কাছেই আছে। নিজের পার্স্‌ নিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেছেন কখন্‌!"

"তবে যে বল্লে তুমি বধ করেচ ? আর তার লাশ—"

"হ্যাঁ, লাশ একখানা বটে! কেষ্টবাবুর গিন্নীকে তুমি কোথায় দেখলে বলো তো ?"

লাশের কথা আমার আর ভালো লাগে না! যে লাশ নিহত অবস্থায় থাকে না, পার্স্ নিয়ে নিজের বাড়ি পিটটান্ মারে সেরকম লাশ দৈবক্রমে চৌকির তলায় চিরনিদ্রায় বিভোর না থাকলেও বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই।

"তাহলে বল্লে কেন যে তুমি ওকে বধ করেচ?" অনুযোগ না করে' পারি না। বাস্তবিক্, এমন করে' গাছে তুলে দিয়ে, ফল-লাভের কাছাকাছি পাঠিয়ে মই কেড়ে 'মা ফলেষু' করে' দেয়ার কোনো মানে হয়?

"বধ করেচি বল্লাম কখন্? ওঃ, ব—ধ করেচি? তোমার ভাষায় বল্‌তে গেলে প্রায় তাইই করা হয়েচে বটে।···তুমি যেমন পাবলিশারদের বধ করে' থাকো, তেম্‌নি।"

"তাই বলো!" আমার স্বস্তির নিশ্বাস পড়েঃ "আমিও তো তাই বলি। তুমি কেন তাকে মারতে যাবে? পরস্ত্রীকে কি কেউ কখনো বধ করে?···কী লাভ তাতে?—"

"ও! নিজের স্ত্রীকে বুঝি বধ করতে হয়?" ফোঁস করে' ওঠে কল্পনাঃ "তাতেই বুঝি বড্ড লাভ, তাই না?"

"তাতেই বা কী লাভ? ভেবে দেখলে, জরু পাবলিশারের চেয়েও কতো জরুরী। একাধারে মুদ্রাযন্ত্র, প্রকাশক, বিজ্ঞাপন-দাতা সব কিছু। স্ত্রীজাতি আমাদের প্রাণে মারলেও কখনো তারা প্রাণে মারবার বস্তু নয়। অবাধ্য হলেও তারা অবধ্য। যাক্‌গে, ও-কথা ছাড়ো, কেষ্টবাবুর গিন্নীকে তুমি কিভাবে

বধ করলে শুনি ? ধরে বেঁধে আমার বইয়ের পাবলিশার করে' দিলে নাকি ?"

কৃষ্ণকায় মেঘের রৌপ্যাকীর্ণ সীমান্ত রেখারা সহসা যেন দেখা দেয়—আমি উৎসাহবোধ করি। এই দুঃসময়ে যদি যৎকিঞ্চিৎ এসে যায়—মন্দ কি ?

"কেষ্টমাসি তোমার বইয়ের পাবলিশার ? তুমি অবাক্ করলে ! কোন্ দুঃখে তিনি তোমার বই ছাপতে যাবেন শুনি ? তাঁদের অমন চমৎকার চালু ব্যবসা থাকতে—?"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে ! কেষ্টমাসি। কেষ্ট মাসিকও নন যে, বই না হোক, নিদেন্ একটা গল্পও চালানো যাবে। হ্যাঁ, মনে পড়েচে, পুরনো জামাকাপড় কেনা-কাটার ব্যবসা, বলেচ বটে তুমি। তা—তাই কিছু কিনলেন না কি ? কিনেছেন ? কিরকম সুবিধে করলে, শুনি তো।"

"সুবিধে আর কী করব ! যা শক্ত মেয়ে কেষ্টমাসি ! প্রথমে ওঁর কেনার মনই ছিল না। বল্লেন মেয়েমানুষ পেয়ে সবাই ওঁকে ঠকিয়ে নেয়, যত বেটপ সাইজের পোষাক আশাক্ গছিয়ে দেয়। কোনো কাজেই লাগে না সে সব ! ঠিক সেই রকম মাপের মাপসই গাওয়ালা কেনবার মানুষ পরে আর না কি খুঁজে পাওয়া যায় না। সবটাই লোকসান ! আমার শাড়িটাড়ি দেখে যা মুখ ব্যাঁকালেন, কী বলব ! বল্লেন, নাঃ, এসবে তাঁর একদম্ দরকার নেই, এগুলো নেহাৎ সেকেলে, এ

তিনি কাজে লাগাতে পারবেন না। বল্লেন, কোনো বেচারামের কম্মো নয় এদের কেনারামকে খুঁজে বার করা।”

“বলো কি? এমন কথা বল্লেন?” বেচারাদের কিনারা পাওয়া এতই কঠিন—ভাবতেই আমার চোখে জল এসে গেল।

“কি করি? সামনে পূজো—পূজোর আমোদ! পুরী যেতে হলে টাকার দরকার তুমি বলেচ। এইসব ভেবেচিন্তে অনেক করে তাঁর মর্জি করালুম। বিস্তর বলবার কইবার পর অল্পকিছু কিনতে তিনি রাজি হলেন। আমার সেই পুরনো বেনারসীটা তাঁকে বেচতে পেরেচি।” কল্পনা একগাল হেসে জানায়।

“সে কী! বেনারসী না কি কখনো পুরনো হয় না আমি শুনেছিলাম।” আমার তাক্ লাগে।

“ক’ বছরের হোলো খেয়াল আছে মশাই? যুদ্ধের আগে কেনা! আর সেই কলাপাতা রঙেরটা, গত বছরের— সেটাও বেচে দিলুম। এখন আর ও-জিনিস পরা চলে না, ওসব ডিজাইন বাতিল হয়ে গেছে আজকাল—কেষ্টমাসিই বল্লেন।”

কলা-কারুর উল্লেখেই আমার মনে পড়ল। কল্পনাকে ওর চেয়ে চমৎকার আর কোনো কিছুতেই মানাত না। আমার বেশ ভালো করেই মনে পড়ল এখন।

এবং বলতে কি, একটু দীর্ঘনিশ্বাসই পড়ে গেল। প্রথম যেদিন ঐ আবরণে ও আমার সঙ্গে সিনেমায় গেছল, মেঘেনের সঙ্গে দেখা—আমার বন্ধু মেঘেন—এখনো মনে পড়ে!

মুগ্ধ কণ্ঠে মেঘেন বলেছিল ঃ "বাঃ, কী সুন্দর শাড়িখানা! কদ্দিয়ে কিনেচো? আহা, ঠিক যেন একটি কবিতা।"

"একটা কবিতা?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "মোটে একটা? অমন কথা বোলো না বন্ধু! তোমার বেলা হয়ত একটা কবিতা হতে পারে কিন্তু আমার বেলায় সাঁইত্রিশটা কবিতা, সাতটা ছোট গল্প, আর আধখানা পুরো নভেল।"

"শাড়িদুটোর বেশ ভালো দাম পেয়েছ আশা করি?" ভারী গলায় আমি জিগেস্ করি।

"ভালো দাম? ভালো দাম দেবার পাত্র মোটেই নন কেষ্ট-মাসি। যাক্‌গে, বকেয়া জিনিসের দরুণ যা পাওয়া গেল তাই লাভ! তবে হ্যাঁ, তসরের ব্লাউজটার বেলা আমি কিছু সুবিধে করতে পেরেচি, আর বলতে কি, ফার্ কোট্‌টারও মন্দ আদায় করিনি। ফার্ কোটটার রোঁয়া উঠতে শুরু করেছিল—যা পাওয়া গেছে তাই লাভ।"

কতটা পাওয়া গেছে আর কেমনতর লাভ তার সঠিক বার্তার জন্য ওকে আর পীড়িত করিনে। কেষ্টবাবুর গিন্নী নেহাৎ মন্দ ব্যবসা করে যাননি, বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

"যাক্‌গে, যেতে দাও।" আমার সান্ত্বনার সুর ঃ "যদি এর ওপর দিয়েই গিয়ে থাকে—যাক্‌গে। আর কিছু ব্যাচোনি তো?"

"বেচব না, মানে?" কল্পনা উস্‌কে ওঠে ঃ "একবার যখন

কেনবার মর্জিতে ওঁকে আনতে পারলাম তখন আমি অমন দাঁও ছেড়ে দিই? মেক্ ইয়োর হে হোয়াইল্ দি সান্ শাইন্স্— কথা নেই একটা? আমিও বেলাবেলি ঘর ছেয়ে নিলাম। আমাদের পুরনো ধুরনো যাকিছু ছিল সব গছিয়ে দিয়েছি, ফাঁকতালে যা এসে যায় তাই লাভ। বরাত কি আর বার বার খোলে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে?"

"কেষ্টবাবুর স্ত্রীহস্তে আর কি কি গছালে?" আমার সন্ত্রস্ত স্বর: "কী কী গেল আরো?"

"দামী অথচ পুরনো যা ছিল কিছু আর বাদ দিলুম না। একবার নোয়াবার পর সবই তাঁকে একে একে নোয়াতে পারলুম। পুরনো জিনিষের মধ্যে তোমার সাদা সিল্কের পাঞ্জাবিটা আমার নজরে পড়ল, আর—"

"কী সর্বনাশ!" আমি হায় হায় করে উঠি।—"য়্যা, বলো কি—ওটাও তুমি বেচে দিয়েচো নাকি?—"

অত্যন্ত ভুল বিচার হলে মেয়েদের যেমন আহত মুখশ্রী হয় সেইরকম মুখ করে' কল্পনা আমার দিকে তাকালো।

"আহা, তাই যেন আমি বেচতে পারি! তোমার একটা সখের জিনিস তোমাকে না জানিয়ে বেচে দিতে পারি যেন! তাছাড়া সমুদ্রের ধারে গিয়ে গায়ে দিয়ে বেড়ানোর জন্যে ঢিলে-ঢালা একটা কিছু চাই তো তোমার। সেই জন্যে, ইচ্ছে করেই ওটা আমি রেখে দিয়েছি, নইলে, কেষ্টমাসিকে ওটা গছানো

যেত না যে তা নয়। তাছাড়া, তোমার তাপ্পিমারা আলোয়ান-টাও রেখে দিলাম। আর তোমার ভায়েলার শার্টটাও! পুরীতে চির-বসন্ত জানি, তবু যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে যায়, বলা যায় না তো। যদিও শার্টটায় ঘাড়ের কাছটায় ছেঁড়া—তা আমি না হয় সেলাই করে' শুধরে দেব এক সময়ে। আর তোমার জহর-মার্কা ওয়েস্ট কোটটাও রেখে দিয়েছি। যদিও জায়গায় জায়গায় ওটার জালি জালি হয়েছে, তবু ওই কোটটার ওপর তোমার বেজায় ঝোঁক জানি বলেই কিছুতেই ওটা আমি ছাড়িনি। আর তা-ছাড়া,—" কল্পনা পুনশ্চ যোগ করে: "তাছাড়া, কেষ্টমাসি ওগুলোর দিকে তাকাতেই চাইলেন না!"

আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

"যাক্, আমার কোনো কিছু তুমি বিক্রি করোনি তাহলে?"

"কেবল তোমার সেই টুইডের স্যুটটা। অমিতাভবাবুর দেখাদেখি যেটা বানিয়েছিলে অথচ পরোনি কোনোদিন, অনর্থক পড়ে পড়ে পচছিল সেইটা বেচে দিলাম। বাক্সে ফেলে রেখে পোকায় কাটিয়ে লাভ? কেষ্টমাসিও তাই বল্লেন। পোকার গর্ভে না দিয়ে বেচে টাকা আনলে কাজ দেবে।"

বাস্! আমার একমাত্র বিলিতি স্যুট—দামী টুইডের স্যুটটা—অবশ্যি, পরিনি কোনোদিন—চক্ষুলজ্জার জন্যই—তবে চেনাশোনার বাইরে—সিম্‌লা কি কাশ্মীরে কখনো গেলে গায়ে চড়াবার বাসনা ছিল—সেটাও বেকসুর বিক্রমপুর গেল?

"স্যুট্‌টার বেশ ভালো দামই দিয়েচেন কেষ্টমাসিমা!" কল্পনা আত্মপ্রসাদে উদ্বেল : 'তোমার সার্জের পাঞ্জাবিটাও মন্দ দিল না। সব জড়িয়ে অনেকগুলো টাকা পেলাম।"

"এই টাকায় এখন কী করতে চাও শুনি?" যদ্দূর সম্ভব নিজেকে প্রসন্নতার প্রদর্শনী করে' তুলতে হয় : "কদ্দূর যেতে চাও? বিলেত?'

কল্পনার সারা মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম তোমায়। যেম্‌নি না কেষ্টবাবুর গিন্নীকে তাড়াতে পারলাম,—ওর খর্পর থেকে যেই না মুক্তি পেয়েছি, অম্‌নি আমি চলে গেছি আমদের ফ্যাশান্‌ স্টোরে। কেমন চমৎকার হাল্‌ ফ্যাসানের খানকয়েক শাড়ি কিনেচি দেখবে এসো। তার মধ্যে একখানা—শাড়িশিল্পের চূড়ান্ত যাকে বলে! কথায় তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না। সেইটে পরে' সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এমন মানাবে আমায়! আর তাতে তোমার প্রেস্‌টিজ্‌ও কতো বেড়ে যাবে, দেখো। সারা পুরীতে ওর কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে এমন আর একখানাও পাবে কি না সন্দেহ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মাইরি!"

কিন্তু আর না, খুব হয়েছে।

দৈবক্রমে পূজোর বন্ধে এবার যদি আপনাদের পুরী যাওয়া হয় এবং সমুদ্রতটে ভ্রমণের সময়ে দৈবাৎ যদি দেখতে পান্‌, শাড়ি-শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন পরিধানে ধরাকে সরা জ্ঞান করে'

লাট্টুর মত অবলীলায় ঘূর্ণায়মান এমন একটি গর্বে ডগমগ, সুন্দরী তরুণীর আঁচল ধরে ম্লানমুখে ঘুরচেন একটি প্রায়-ভদ্রলোক, পরণে তার আধ ময়লা খদ্দর, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি অথবা (শীত শীত করলে) ভায়েলার শার্ট (কাঁধের কাছটায় ছেঁড়া—সেলাই না হয়ে থাকলে), এবং তার ওপরে জহরলালী কায়দার ওয়েস্টকোট্ (জায়গায় জায়গায় জালি কিম্বা রিপুকর্মের জালিয়াতি) এবং তার ওপরে হয়ত বা একটা আলোয়ান (তারও স্থানে অস্থানে তালিমারা)—আলোয়ানটাও থাকা সম্ভব, কেননা পুরীর বসন্ত পূরোপূরি হলেও, বলা যায় না, যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে যায়—এবং এই সবের ওপরে, অর্থাৎ নীচে, সবার ওপরে টেক্কা মেরে শ্রীপাদপদ্মে পেছনের-ধার-ক্ষয়ে-যাওয়া বোম্বে-শ্লিপার······এক অপরূপ- সাজসজ্জার আশেপাশে এহেন শোচনীয় বেশভূষায় কাউকে যদি দেখতে পান—এরূপ অপূর্ব যোগাযোগ যদি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে বুঝবেন সে-ব্যক্তি আর কেউ নয়, সে আমি। সে-ই আমি। রবীন্দ্রনাথের ভ্রষ্টলগ্নের শেষ লাইনটি স্মরণ করবেন, এবং ভুল করেও পুরীর ত্রিসীমানায় পা বাড়াবেন না।

বাড়াতে চান বাড়াবেন। কিন্তু শেষে যেন বল্‌বেন না যে যথাসময়ে আপনাদের সাবধান করে দিইনি।